কথা সরিৎসাগরের গল্প

তারাপদ রাহা

এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীঅনিলকুমার সরকার
এ. কে. সরকার অ্যাণ্ড কোং
১।১এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারী, ১৯৬০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৩ডি, মদন মিত্র

উপহার





কথা সরিৎসাগরের গল্প

।ত ।
হয়ে জ
করতে
এরপর
দেবতা
দিলা
কিনে
জন্য



কৈলাসে শিব পার্বতীকে গল্প বলা শুরু করে

সূচনা

একদিন কৈলাসে পার্বতী শিবকে বললেন, প্রভু, আজ আমার বড় গল্প শুনতে ইচ্ছা করছে। আপনি এমন কিছু বলুন না—যা অতি সুন্দর অথচ আর কেউ কোনদিন শোনেনি।

শঙ্কর মৃদু হেসে বললেন, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সবই ত তোমার জানা,—তোমার কাছে আবার নতুন কথা কি বলবো? যাক, শুনতে যখন চাইছ তখন কিছু বলি শোন:

তুমি পূর্বজন্মেও আমার স্ত্রী ছিলে। তখন প্রজাপতি দক্ষ ছিলেন তোমার পিতা। একবারকার এক যজ্ঞে তিনি আর আর জামাইদের নিমন্ত্রণ করলেন অথচ আমায় করলেন না, তুমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দিলেন: তোর বর নর-কপালধারী, শ্মশানচারী—অতি জঘন্য, তাই তাকে আর আমি ডাকিনি। বাপের মুখে এই সব পতিনিন্দা শুনে তুমি দেহত্যাগ করেছিলে। এতে রাগে আর শোকে আমি তোমার বাপের যজ্ঞ পণ্ড ক'রে দি। তারপর মনে পড়ে—তুমি এরপর হিমালয়ের কন্যা হয়ে জন্মালে? মনে পড়ে—আমি তোমার বাপের রাজ্যে তপস্যা করতে গেলে তিনি তোমায় আমার পরিচর্যায় নিয়োগ করলেন? এরপর তারকাসুরকে মারবার জন্য আমার বীরপুত্র চাই ব'লে দেবতারা আমায় ভুলাতে পাঠালেন মদনকে। তাকে ভস্ম ক'রে দিলাম আমি। তারপর?—তারপর তপস্যার দ্বারা তুমি আমায় কিনে নিলে—শুধু একদিনের জন্য নয়—একেবারে চিরদিনের জন্য—কেমন?

একটু থেমে শিব আবার বললেন, এই ত তোমাকে অর্ধাঙ্গিনী রূপে পাবার গল্প বললাম, আর কি শুনতে চাও বলো?

পার্বতী মোটেই খুশি হ'লেন না এ কথা শুনে। রেগে গেলেন —অভিমানও হ'ল তাঁর খুব। বললেন, আপনার চালাকি রাখুন। হ'তাম গঙ্গা—মাথায় ক'রে রাখতেন, আর অনুরোধও রাখতেন!

পার্বতী ভীষণ রেগে গেছেন দেখে শিব মৃদু হেসে তাঁকে খুশি করবার জন্য সত্যিকার মনোহর গল্প আরম্ভ করলেন—কিন্তু তাঁর ইচ্ছা নয়, এ-গল্প পার্বতী ছাড়া আর কেউ শোনে, তাই নন্দীকে ডেকে বললেন, ওহে, তোমাদের ঠাকরুনকে কিছু গোপন কথা বলছি—দেখো, কেউ যেন এখন আমার কাছে না আসে।

শঙ্কর বললেন বটে এ কথা—কিন্তু পুষ্পদন্ত নামে তাঁর এক অনুচর যোগবলে নন্দীর অদৃশ্য থেকে শিবের সব কথাই শুনে নিলে। এমন সুন্দর গল্প—নিজের স্ত্রীর কাছে না ব'লে পারা যায়?...পুষ্পদন্ত তার স্ত্রী জয়ার কাছে গিয়ে এ-সব গল্পই তাকে শুনিয়ে দিলে—জয়া আবার নিজের ঠাকুরানির কাছে বাহবা নিতে সব গল্প শুনেই হুবহু তাঁকে ব'লে গেল।

জয়ার মুখে স্বামীর বলা-গল্প অবিকল শুনে পার্বতী আবার ভীষণ রেগে গিয়ে স্বামীকে বললেন, এই বুঝি আমায় নতুন গল্প শোনানো?—আপনি যে-সব গল্প আমায় বলেছেন, জয়া যে একটু আগে আমায় সে সবই শুনিয়ে গেল!

শিব পার্বতীর কথায় হতচকিত হয়ে তখনই ধ্যানে বসলেন,—যোগাসনে সবকিছুই জানা হয়ে গেল তাঁর। তিনি তখন পার্বতীকে বললেন, তুমি বৃথাই রাগ করছ? আমার এ-গল্প জগতের কেউই জানত না—আমি যখন তোমার কাছে বলি তখন পুষ্পদন্ত গোপনে শুনে নিজের স্ত্রী জয়ার কাছে বলেছে—তাই এত সব কাণ্ড!

শুনে পার্বতী ভীষণ চটে গিয়ে পুষ্পদন্তকে মানুষ হয়ে জন্মাবার জন্য অভিসম্পাত করলেন। পুষ্পদন্তের বন্ধু মাল্যবান পুষ্পদন্তের

জন্য অনুরোধ করতে এলে তাঁকেও অভিশাপ দিলেন দেবী মানুষ হ'তে। দেবীর পায়ে পড়ে অনেক অনুনয়-বিনয়, কান্নাকাটি করতে লাগল মাল্যবান আর জয়া শাপমুক্তির জন্য। দেবী প্রসন্ন হয়ে পুষ্পদন্তকে বললেন, শোন পুষ্পদন্ত, এক যক্ষ কুবেরের শাপে নিশাচর পিশাচ হয়ে জন্মেছে—নাম হয়েছে তার কাণভূতি, থাকে সে বিন্ধ্যারণ্যে। তার সঙ্গে দেখা হ'লে পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ায় তুমি যখন তার কাছে এই সব গল্প বলবে তখন তোমার ও কাণভূতির শাপমুক্তি হবে--সেই সঙ্গে মাল্যবানেরও হবে।

পুষ্পদন্ত মর্ত্যে এসে জন্মগ্রহণ করলে নাম হ'ল তার বররুচি—তাঁর আর এক নাম হ'ল কাত্যায়ন। বিদ্যাবলে শেষে তিনি নন্দরাজের মন্ত্রী হয়েছিলেন! আর এদিকে মানুষ হয়ে মাল্যবানের নাম হ'ল গুণাঢ্য।

যথাসময়ে বিন্ধ্যারণ্যে কাণভূতির সঙ্গে দেখা হ'ল বররুচির। দেখা হ'লেই দুইজনের পূর্বজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ হ'ল। বররুচি তখন শিবের মুখের গল্পগুলি তাকে শোনালেন, কাণভূতি আবার তা যথা সময়ে শোনাল তার বন্ধু গুণাঢ্যকে। শুনে তিনজনেরই শাপমুক্তি হয়ে গেল।

গল্পগুলি বলতে গেলে যেন শেষ হ'তে চায় না,—হবেই ত! সাত লক্ষ শ্লোকে যে এগুলি রচনা করা হয়েছে! এই অসংখ্য গল্পগুলির মাঝ থেকে মাত্র কয়েকটি বেছে—এই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হ'ল।

এত কথা বলবার পরও একটা প্রশ্ন রয়ে গেল, সে প্রশ্নটা হচ্ছে—গল্পগুলি গ্রন্থাকারে পাওয়া গেল কি ক'রে? তার উত্তর হচ্ছে—গুণাঢ্য আবার মাল্যবান হয়ে স্বর্গে যাবার আগে—মানুষ থাকবার সময়েই সাতলক্ষ শ্লোকে আমাদের জন্য এগুলি লিখে রেখে যান। নাম হয় তার 'বৃহৎ কথা'। আবার তারই সারাংশ নিয়ে সোমদেব ভট্ট যে বই লিখলেন তারই নাম—কথা সরিৎসাগর।

পাটলীপুত্রের উপাখ্যান

স্বর্গের নদী গঙ্গা যেখানে এসে মর্ত্যে অবতরণ করেছে সেখানে রয়েছে হিন্দুদের দুটি তীর্থ, হরিদ্বার আর কনখল। বড় সুন্দর জায়গা, স্বর্গ আর মর্ত্যের যেন মিলন ঘটেছে এখানে। বহুলোক এখানে তপস্যা করতে আসেন। দাক্ষিণাত্য থেকে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বহুদিন আগে এখানে তপস্যা করতে আসেন। এখানেই তাঁদের তিনটি ছেলে হয়। ছেলেরা একটু বড় হ'লে, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর যখন গঙ্গাপ্রাপ্তি হ'ল, তখন তারা লেখাপড়া শিখবার জন্য রাজগৃহে এল। বেশ কয়েক বছর সেখানে থেকে বিদ্যাশিক্ষা যখন শেষ হ'ল তখন তাদের বড় ইচ্ছা হ'ল পৈতৃক ভিটে দেখতে। গুরুকে প্রণাম ক'রে তাঁর অনুমতি নিয়ে তখন তারা রওনা হ'ল দাক্ষিণাত্যের দিকে।

কত নদী-মাঠ-গ্রাম-জনপদ অতিক্রম ক'রে অবশেষে তারা দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রের কাছাকাছি একটা গ্রামে ভোদক নামে এক ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে অতিথি হ'ল। সম্পন্ন গৃহস্থ ভোদক, অতি সজ্জনও বটে, তিনটি তরুণ ব্রাহ্মণ অতিথিকে পরম সমাদরে ঘরে স্থান দিলেন। তিনটি ছেলেরই সুন্দর চেহারা। তাছাড়া, ক্রমে বিদ্যার পরিচয় পেয়ে তাদের আর ছাড়তে চান না। ভোদকের কিন্তু নিজের স্বার্থও একটু ছিল: তিনটি বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল তাঁর। তারা সুন্দরীও বটে। তিনটি ব্রাহ্মণ কুমারকে দেখেই তাঁর ইচ্ছা হয়েছিল এদের তিনটির হাতে নিজের কন্যা তিনটিকে সম্প্রদান করতে। তাঁর এ ইচ্ছা শেষে পূর্ণও হ'ল। দীর্ঘকাল সযত্ন আতিথ্যে পরিতৃপ্ত ব্রাহ্মণ কুমারদের কাছে একদিন যখন তিনি নিজের মনোগত অভিলাষটি জানালেন তখন তারা

তার 'না' করতে পারলে না। আর না করবেই বা কেন—সুন্দরী ভার্যা, আর তাছাড়া প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি।

ভাল দিন দেখে বিয়ে হয়ে গেল। মেয়েদের বিয়ের পর সাংসারিক কর্তব্য শেষ হয়ে যাওয়ায় ভোদক বিষয়-সম্পত্তি তিন জামাইয়ের মাঝে ভাগ ক'রে দিয়ে নিজে তপস্যার জন্য গঙ্গাতীরে চলে গেলেন। জামাই-মেয়েরা বেশ সুখেই ঘরগৃহস্থালি করতে লাগল।

কিন্তু সুখ ত চিরদিনের মতো কারো ভাগ্যে লেখা নেই, সুখের পর দুঃখ আসবেই, এই সংসারের নিয়ম, বিধাতার নিয়ম। দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল, ক্রমে তা ভীষণ হয়ে উঠল, মারাত্মক হয়ে উঠল। ঘরে ঘরে অন্নের জন্য হাহাকার। দূর দেশে গেলে যদি দুটি অন্ন মেলে—এই আশায় বহু লোক তাদের স্ত্রী-পুত্র ফেলে দূর দেশে পালিয়ে যেতে লাগল। ভোদকের জামাই তিনটিও তাদের স্ত্রীদের অকূল পাথারে ভাসিয়ে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ভোদকের তিন মেয়ে। বিষয়-সম্পত্তি থেকেও নেই, অর্থাৎ তার অন্ন দেবার ক্ষমতা নেই,—ফসল হয়নি, স্বামী কাছে নেই। বাপ তপস্যার জন্য কোথায় গিয়ে রয়েছেন তার ঠিক নেই, এখন কি করবে তারা?

করার আর কিছুই ছিল না বাড়িতে, সুতরাং পতি-পাদপদ্ম স্মরণ ক'রে, সাহসে ভর ক'রে একদিন তারা নিজেদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। অনেক পথ হেঁটে, অনেক গ্রাম অতিক্রম ক'রে একদিন তারা যেখানে দুর্ভিক্ষ নেই এমন একটা গ্রামের এক ভদ্রগৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় প্রার্থনা করল। তিনটি তরুণী মেয়েকে এমন শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখে গৃহস্বামী পরম সমাদরে তাদের নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন।

গৃহস্বামীর নাম যজ্ঞদত্ত। আহারান্তে যজ্ঞদত্ত যখন মেয়ে তিনটির

পরিচয় নিলেন, তখন তিনি দেখলেন এরা তিনটি তাঁর বন্ধু ভোদকের কন্যা। পরিচয় পেয়ে যজ্ঞদত্ত নিতান্ত স্নেহশীল হয়ে উঠলেন মেয়ে তিনটির প্রতি। তাদের আর কোথাও যেতে না দিয়ে নিজের বাড়িতেই নিজের মেয়ের মতো পালন করতে লাগলেন। খাওয়া-দাওয়া থাকার আর কোন কষ্ট রইল না বটে, কিন্তু স্বামীকে দেখতে না পেয়ে কোন বোনের মনেই শান্তি রইল না।

ভোদকের এক মেয়ে সন্তানসম্ভবা ছিল, যজ্ঞদত্তের বাড়িতে থাকবার সময়েই তার একটা পুত্রসন্তান লাভ হ'ল। ছেলেটি দেখতে বড় সুন্দর। এত দুঃখের মাঝেও একটা আনন্দের কারণ ঘটল তিন বোনের। তিন বোনের এক ছেলে! তিন মায়ের স্নেহ-যত্নে ছেলেটি বড় হ'তে লাগল। তিন বোন সব সময় ছেলেটিকে ঘিরে বসে থাকে। কোন সময় চোখের আড়াল করতে চায় না।

একদিন পার্বতী আকাশে তাঁর স্বামী শিবের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ ওদের দিকে নজর পড়তে তাঁর স্বামীকে বললেন, প্রভু, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

কি?

ঐ যে তিনটি স্ত্রীলোক একটি ছেলেকে ঘিরে বসে আছে, আমার বড় ইচ্ছা হচ্ছে ওদের একটু সুখী করি, বড় দুঃখ পেয়েছে ওরা জীবনে। ওদের ঐ ছেলেটিকে আপনি একটু ঐশ্বর্যশালী ক'রে দিন না।

শিব মৃদু হেসে বললেন, তোমার ইচ্ছা কি আমি কোনদিন অপূর্ণ রাখি? তাছাড়া, ঐ শিশু পূর্বজন্মে আমার ভক্ত ছিল, ওর স্ত্রীও ছিল আমার ভক্ত, সে এখন রাজা মহেন্দ্রবর্মার কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। নাম হয়েছে তার পাটলী। পাটলী এ-জন্মেও ঐ শিশুর ভার্যা হবে।

শুনে বড় খুশি হ'লেন পার্বতী।

রাত্রে ঐ তিন বোন ঘুমিয়ে আছে, এমন সময় তারা এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলে। দেখলে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে জটাজূটধারী এক মহাপুরুষ, পরিধানে তাঁর বাঘছাল, গায়ে ভস্মমাখা, দেহবর্ণ তুষারকেও হার মানায়। মহাপুরুষ তাদের দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে চেয়ে বলছেন, তোমাদের সকল দুর্গতি দূর করতে আমি এসেছি. এই ছেলে থেকে তোমাদের সকল দুঃখের অবসান হবে। ছেলেটি রোজ সকালে যেই ঘুম থেকে জাগবে সঙ্গে সঙ্গে তোমরা ওর শিয়রে এক লক্ষ ক'রে স্বর্ণমুদ্রা দেখতে পাবে। ওর নাম হবে পুত্রক। পুত্রক বড় হয়ে বহু ধন-সম্পত্তির অধীশ্বর হয়ে বহুস্থানে আধিপত্য বিস্তার ক'রে তোমাদের সুখী করবে। এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন।

এদিকে ঘুম ভেঙে গেলে ওরা তিন বোনই বুঝলে স্বপ্নে দেবাদিদেব মহাদেব দেখা দিয়েছেন তাদের। স্বপ্নকথা স্মরণ ক'রে তাদের আনন্দ আর বিস্ময়ের অবধি রইল না।

ক্রমে রাত্রি ভোর হ'ল। শিশু জাগল। জাগলেই দেখা গেল তার বিছানার ধারে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি। শুধু সেই একদিন নয়—এমনি হ'তে লাগল দিনের পর দিন। মুখে হাসি ফুটে উঠল তিনটি বোনের। এর আগে বড় দুঃখ পেতে হয়েছে তাদের জীবনে, স্বামিধনে বঞ্চিত হয়ে ভিখারিণীর মতো পথে পথে ঘুরতে হয়েছে তাদের। দেবতার কৃপায় তাদের স্নেহের পুত্তলী থেকেই তাদের সকল দুঃখ দূর হ'ল। আনন্দে গলে গিয়ে তিন বোনই বারবার পুত্রকের মুখচুম্বন করতে থাকেন, বেঁচে থাকো বাবা, বেঁচে থাকো, সুখে থাকো।

ঐখানে থেকেই পুত্রক বড় হয়ে উঠলেন, লাভ হ'ল বিপুল ঐশ্বর্য,—ধন, রাজ্য, পরিজন, সংসারী লোকেরা যা-কিছু পেলে নিজেদের সৌভাগ্যবান্ মনে করে। শিবের আশীর্বাদে

সে সব কিছুই পেলেন তিনি, তাঁর মা, মাসীরা হ'লেন রাজমাতা।

সবই হ'ল কিন্তু একটি দুঃখ রয়ে গেল তিন বোনেরই মনে। স্বামিদর্শন থেকে তারা বহুকাল, বহু বৎসর বঞ্চিত। তাদের আশ্রয়দাতা যজ্ঞদত্ত বুঝতেন সে কথা,—তিনি যে তাদের নিজের মেয়ের মতো ভালবেসেছিলেন। পুত্রক নিজে কিছুই জানেন না, কিছুই শোনেননি। একদিন যজ্ঞদত্তই এগিয়ে গেলেন রাজা পুত্রকের কাছে:

বৎস, একটা কথা আছে।

বলুন।

তুমি জানো না,—তোমার মা, মাসীরা বলেননি কোনদিন তোমার কাছে। তাদের মনে একটি বড় রকমের দুঃখ আছে।

পুত্রকের দুই চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা ফুটে উঠল।

তুমি ভূমিষ্ঠ হবার আগে এক দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নের ব্যবস্থা না করতে পেরে, তোমার বাপ আর দুই কাকা নিরুদ্দেশ হন। সেই থেকে তাঁদের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। তোমার মা-মাসীদের মনে এই জন্য একটা বড় রকমের দুঃখ আছে, তুমি সেটা দূর করবার চেষ্টা কর।

কি ক'রে করব বলুন?

আমি একটা উপায় ঠাওরেছি। তুমি যদি ব্রাহ্মণদের ধন দান করবে ব'লে চারিদিকে দেশে বিদেশে ঘোষণা ক'রে দাও, তাহলে দান নিতে চান যে-সব ব্রাহ্মণ তাঁদের সঙ্গে তাঁরাও এসে যেতে পারেন, এ ছাড়া ত আমি আর অন্য কোন উপায় দেখি না।

কথাটা পুত্রকের বড় মনে ধরল। তিনি দেশে দেশে দূত পাঠিয়ে নিজের দানের খবর ঘোষণা করতে লাগলেন। এদিকে রাজভবন নানা ধনরত্ন এবং দানসামগ্রীতে পূর্ণ হ'তে লাগল।

নির্দিষ্ট দিনে দান নিতে বহু ব্রাহ্মণ আসতে লাগলেন। যজ্ঞদত্ত তাঁদের দেখেন আর কৌশলে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। এক সময় প্রায় একই রকমের চেহারার তিনজন ব্রাহ্মণকে দেখে যজ্ঞদত্তের বিশেষ সন্দেহ হ'ল, পরিচয় জিজ্ঞাসার পর জানা গেল, এই তিনজনই পুত্রকের বাপ ও কাকা।

যজ্ঞদত্ত খবরটা পুত্রককে জানালে তিনি তখনই এসে তাঁর বাপ এবং কাকা দুইজনকে পরম সমাদরে রাজভবনে নিয়ে এলেন। এতদিন পরে স্বামীর দেখা পেয়ে মা-মাসীদের মনে আনন্দের সীমা রইল না। পুত্রকের বাপ-কাকারা রাজভবনে থেকে পরমসুখে দিন কাটাতে লাগলেন। পুত্রকের রাজৈশ্বর্য আরও বাড়তে লাগল, তাঁর সুশাসনে প্রজারা তাঁকে আরও ভালবাসতে লাগল।

পুত্রকের এমন ঐশ্বর্য, সম্মান এবং প্রতিপত্তি দেখে তাঁর বাপ-কাকারা কিন্তু মোটেই খুশি হ'তে পারছেন না। তপস্বীর পুত্র হ'লেও লোক তাঁরা মোটেই ভাল নয়। চিরদিন তাঁরা দুঃখ-কষ্টে কাটিয়ে এসেছেন, আর ছেলে তাদের অতুল ঐশ্বর্য ভোগ করছে! হিংসায় তাঁদের মন জ্বলে যেতে লাগল। কি ক'রে পুত্রকের ঐশ্বর্য আত্মসাৎ করা যায়—দিবারাত্র তাঁদের এই চিন্তা। অবশেষে উপায়ও একটা তাঁরা ঠাওরালেন। তাঁরা ঠিক করলেন গুপ্তঘাতকের দ্বারা পুত্রকের প্রাণনাশ ক'রে তাঁরা তাঁর সাম্রাজ্যের অধিকারী হবেন।

একদিন সবকিছু ঠিক ক'রে সুযোগ বুঝে তাঁরা পুত্রকের কাছে গিয়ে বললেন, বৎস, আজ পুণ্যতিথি, আজ দেবী বিন্ধ্যবাসিনীর দর্শনে বড় পুণ্য হয়। চলো না, দেবীদর্শন করে আসি!

এতে আর আপত্তি কি থাকতে পারে, পুত্রক তখনই রাজী হয়ে গেলেন। আর বাপ-কাকার সঙ্গে যাবেন, প্রহরী সঙ্গে নেবারই বা দরকার কি! একাই চললেন পিতৃগণের সঙ্গে।

ক্রমে তাঁরা মন্দিরের কাছাকাছি এসে গেলেন। মন্দিরের চারিদিকে অনেকগুলি গাছ—রাত্রে বেশ অন্ধকার। আশে-পাশে কোন লোকজনের চলাফেরা নেই। এখানে রাত্রে আসতে গেলেই অনেকেরই গা ছমছম করে। পুত্রকের কিন্তু একটুও ভয় করল না, তিনি নিষ্পাপ। ক্রমেই এগিয়ে চললেন। বাপ-কাকারা বললেন, তুমিই বাপু আগে দেবীদর্শন করে এসো, দেশের রাজা তুমি, আমরা পরে আসছি।

পুত্রক মন্দিরে প্রবেশ করলেন। তারপর যেই দেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন অমনি মন্দিরের একপাশ থেকে কয়েকজন দস্যু এসে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। দেখে অবাক হয়ে গেলেন তিনি, কিন্তু একটুও ঘাবড়ালেন না। স্থিরকণ্ঠে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা, আমাকে হত্যা করতেই বা চাইছ কেন তোমরা?

দস্যুরা উত্তর দিল, আমরা দস্যু, তোমার বাপ-কাকারা আমাদের টাকা দিয়েছেন তোমাকে মারবার জন্যে।

পুত্রক বললেন, অর্থের জন্যই যদি তোমরা এ কাজ করতে এসে থাক, তবে আমি তোমাদের প্রচুর অর্থ দিচ্ছি, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও।

রাজী হয়ে গেল দস্যুরা। পুত্রক নিজের গা থেকে সমস্ত রত্নালঙ্কার খুলে তাদের দান করলেন। দস্যুরা খুশি হয়ে মন্দির ছেড়ে চলল। পথে পুত্রকের বাপ-কাকারা যেখানে লুকিয়ে ছিলেন সে পথ দিয়ে যাবার সময় তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, কাজ হাসিল?

হ্যাঁ, হাসিল। তাঁকে শেষ ক'রে এসেছি আমরা।

শুনে খুব খুশি পুত্রকের বাপ-কাকারা। বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দিরে আর তাঁরা গেলেন না, মনের আনন্দে নানা জল্পনা-কল্পনা করতে করতে রাজধানীর দিকে রওনা হ'লেন।



কয়েকজন দস্যু এসে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হ'ল

পুত্রক অন্য এক পথে তাঁদের আগেই রাজধানীতে এসে পৌঁছলেন। এসেই এই হীন ষড়যন্ত্রের কথা তিনি তাঁর মন্ত্রীদের কাছে খুলে বললেন। ষড়যন্ত্রকারীরা রাজধানীতে আসার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীদের আদেশে প্রথমে তাঁদের বন্দী করা হ'ল, তারপর বিচারের পর প্রকাশ্য রাজপথে তাঁদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ল।

পুত্রকের রাজ্য নিষ্কণ্টক হ'ল বটে, কিন্তু মনে তাঁর বিন্দুমাত্র শান্তি রইল না: এই সংসার! ঐশ্বর্যলোভে, রাজ্যলোভে বাপ-কাকারা ছেলেকে হত্যা করতে চায়?—এ সংসারে আর আমি থাকব না। সংসারে বীতরাগ হয়ে সব ছেড়েছুড়ে পুত্রক বিন্ধ্যাচলের এক নির্জন জায়গায় গিয়ে একা বাস করতে লাগলেন।

পুত্রক বনের মধ্যে তাঁর কুটীরের সামনে বসে আছেন এমন সময় ভীমাকৃতি দুটি লোক নিজেদের মাঝে মারামারি করতে করতে তাঁর সামনে এসে হাজির হ'ল। পুত্রক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা, এমন মারামারিই বা করছ কেন?

ওরা উত্তর দিলে, আমরা ময়দানবের পুত্র। পৈতৃক ধনের মাঝে পেয়েছি মাত্র একটি থালা, একখানা লাঠি আর এক জোড়া খড়ম। এখন কে এগুলির মালিক হবে? আমরা ঠিক করেছি—বাহুযুদ্ধে যে অপরকে হারিয়ে দিতে পারবে সেই এগুলির মালিক হবে।

পুত্রক ওদের কাণ্ড দেখে ঈষৎ হেসে বললেন, আচ্ছা, পাগল সব! সামান্য জিনিস, এরই জন্যে দুই ভায়ে মারামারি!

ওরা বললে, যা ভাবছেন আপনি তা নয়, জিনিসগুলি সামান্য নয়। এদের গুণ শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এই যে খড়ম জোড়া দেখছেন—এ একবার পায়ে পরলে যে-কেউ শূন্যপথে যেখানে খুশি মুহূর্তমধ্যে চলে যেতে পারে।

আর এই যে লাঠি—এ দিয়ে যা কিছু লেখা হবে, তদ্দণ্ডে তাই সত্যে পরিণত হবে, আর এই যে থালা—এ হাতে ক'রে যে-কোন খাবারের কথা মনে করা যাবে, মুহূর্তমধ্যে সেই খাবার এসে এতে হাজির হবে। সুতরাং যা ভাবছেন আপনি, তা নয়।

পুত্রক জিনিসগুলির গুণের কথা শুনে খুবই বিস্মিত হ'লেন। ওদের গুণ নিজে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবারও ইচ্ছা হ'ল খুব। কিন্তু দুই দানবের সামনে তা কি করে হবে? অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি এক বুদ্ধি ঠাউরে ওদের বললেন, তোমাদের মাঝে কার বল বেশি, তাই ত পরীক্ষা করতে চাও তোমরা?

হ্যাঁ।

তাহলে এক কাজ করো তোমরা, জিনিসগুলি এখানে রেখে তোমরা খুব জোরে দৌড়তে থাক, দৌড়ে যে অপরকে হারাতে পারবে, জিনিস তারই হবে।

দানব দুই ভায়ের চেহারাই ভীমের মতো, মাথায় কিছুই নেই। পুত্রকের কথা শুনে তারা দৌড়তে শুরু ক'রে দিলে। দৌড়তে দৌড়তে দূরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। এই সুযোগে পুত্রক লাঠি আর থালাটা হাতে নিয়ে খড়ম জোড়া দিলেন পায়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আকাশে উঠে দ্রুত চলতে শুরু করলেন। দেশ-দেশান্তরের উপর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর সামনে পড়ল সুন্দর একটা পুরী। পুত্রক নেমে পড়লেন সেখানে কিন্তু কোথায় কার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেবেন? কোন বণিকের বাড়িতে যাওয়া নয়, বণিকরা বড় লোভী, আমার বাপ-কাকাদের মতো। কোন খারাপ লোকের বাড়িতেও নয়। কোথায় যাই।

খুঁজতে খুঁজতে একটা ছোট্ট জীর্ণ কুটীর চোখে পড়ল। দেখা যাক্ কে থাকে এখানে! দেখা গেল এক বুড়িকে। এই ভাল, এর এখানেই থাকা যাক্, একে কিছু কিছু দিলেই চলবে।

অর্থ সাহায্য পেয়ে বুড়ি সহজেই রাজী হয়ে গেল। দানবদের লাঠি দিয়ে লিখে অর্থলাভ পুত্রকের পক্ষে কিছু কষ্টকর নয়। পুত্রক বেশ সুখেই কিছুদিন কাটালেন বুড়ির বাড়িতে।

কিছুদিন যাবার পর বুড়ি একদিন পুত্রককে বললে,—আচ্ছা বাবা, তোমাকে দেখে একটা কথা মনে হয় আমার, বলবো?

বলো।

তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি কোন বড়লোকের ছেলে—কোন রাজপুত্তুরটুত্তুর হবে, আর মনে হয় বিয়েও তোমার হয়নি। তা আমাদের এখানকার যে রাজা—তার এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, নাম তার পাটলী। তোমাদের দুটিতে বড় মানায়, বাবা! তার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হয় ত বেশ হয়।

বুড়ির কথা বেশ মন দিয়ে শুনলেন পুত্রক, কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। মনে মনে শুধু ভাবতে লাগলেন এই মেয়েটিকে কি ক'রে দেখা যায়! আচ্ছা, রাত্রি হ'ক ত!

রাত্রি হ'লে, বুড়ি ঘুমুলে, রাজবাড়ির সবাই ঘুমুলে পুত্রক সেই খড়ম পরে উঠলেন আকাশে। তারপর ঘুরতে ঘুরতে রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হ'লেন। আকাশপথে চলেই খুঁজতে লাগলেন ঘরে ঘরে—কোথায় সেই রাজকন্যা পাটলী।

হঠাৎ একটা কামরায় নজর পড়তেই দেখেন এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ে শুয়ে আছে সেই ঘরে। রূপে যেন ঘর আলো ক'রে রয়েছে। বুঝলেন এই সেই পাটলী। পুত্রক সন্তর্পণে জানলা দিয়ে ঢুকলেন সেই ঘরে। কিন্তু এ যে ঘুমিয়ে, কি ক'রে একে জাগানো যায়? কিছুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে অনেক ভেবে-চিন্তে মেয়েটির হাতটা একটু জোরে চেপে ধরলেন। পাটলী অমনি চোখ মেললো। চোখ মেলেই যাকে দেখল তাকে দেখেই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। একটুও রাগ করল না পাটলী। তারও বিয়ের

বয়স হয়েছে। বিয়ে করার মতো এক সুন্দর তরুণকে নিজের ঘরের মাঝে কাছে পেয়ে সে রাগ করবে কেন, বরং খুবই ভাল লাগল তার।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের আলাপ-সালাপ, ভাব জমে উঠল। বিধাতা যেন এদের পরস্পরের জন্যেই গড়েছেন। তাই শুধু ভাব নয়, সেই রাত্রেই দু'জনার গান্ধর্ব মতে বিয়ে হয়ে গেল। বাকী রাতটুকু কথাবার্তায়, আলাপ-সালাপে বেশ সুখেই কাটল। ভোর হবার একটু আগে পুত্রক রাজকন্যা পাটলীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খড়ম পায়ে আবার বুড়ির বাড়িতে চললেন। যাবার সময় বলে গেলেন, আবার কাল আসব।

পুত্রক তারপরদিন রাত্রে আবার এলেন, তার পরের দিনও। এমনি ক'রে প্রতিদিন রাত্রে তাঁদের দেখা হ'তে লাগল। সারারাত পাটলীর ঘরে কাটিয়ে ভোরের দিকে পুত্রক বৃদ্ধার ঘরে ফিরে যান।

কিন্তু আগুন কোনদিন চাপা থাকে না—সত্যও না। ক্রমে রাজপ্রাসাদের রক্ষীরা ব্যাপারটা টের পেল। মেয়ের কাছে যে রোজ রাত্রে কে একজন যুবাপুরুষ আসে এ কথা রাজার কর্ণগোচর করলে তারা। রাজা মেয়ের কীর্তির কথা শুনে গেলেন ভীষণ চটে। কিন্তু চটলে ত শুধু হবে না। লোকটি কে—তাকে ধরা চাই। তবেই মেয়ে এবং তার বিচার হবে, শাস্তি হবে।

রাজা লোকটিকে ধরবার জন্য এক কৌশল করলেন। একটি চালাক-চৌকস বিশ্বস্ত স্ত্রীলোককে তিনি নিযুক্ত করলেন। সে গিয়ে আগে থেকেই পাটলীর ঘরে লুকিয়ে থাকবে, তারপর সব কিছু জেনে-শুনে তাকে ধরবার ব্যবস্থা করবে।

সন্ধ্যার পর রাজকন্যা শোবার ঘরে ঢুকবার আগেই ধূর্ত স্ত্রীলোকটি সেখানে গিয়ে পালঙ্কের নিচে লুকিয়ে রইল। রাত্রি গভীর হ'ল, পুত্রক খড়ম পায়ে দিয়ে পাটলীর ঘরে এসে হাজির হ'লেন।

স্ত্রীলোকটি তা দেখলে। ওদের যে আলাপ-সালাপ হ'ল তা সে শুনলে। কিছুক্ষণ পর পুত্রক রাজকন্যার পাশে পালঙ্কের উপর ঘুমিয়ে পড়ল। ধূর্ত স্ত্রীলোকটি বাড়ি থেকে কিছুটা আলতা এনেছিল, তারই কিছুটা সে পুত্রকের কাপড়ের এক কোণে লাগিয়ে দিল। ঘুমন্ত পুত্রক তা টেরও পেল না।

রাত্রি ভোর হবার একটু আগেই পুত্রক সেখান থেকে খড়ম পায়ে আবার বৃদ্ধার কুটীরে ফিরে গেল। ভোর হ'তেই রাজবাড়ি থেকে মহা হট্টগোল শোনা গেল: চোর, চোর—চোর এসেছিল রাজবাড়িতে।—খোঁজ খোঁজ—যেখান থেকে পারো ধরে আন চোর।

রাজকর্মচারীরা তখনই চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু ক'রে দিল। স্ত্রীলোকটি ব'লে দিয়েছিল চোরের কাপড়ে সে একটু আলতার দাগ লাগিয়ে দিয়েছে।

এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে বুড়ির বাড়িতে আলতার দাগলাগা কাপড়ে পুত্রককে পাওয়া গেল। রাজকর্মচারীরা তখনই তাঁকে রাজার কাছে ধরে আনল। দোষীকে দেখামাত্র রাজার আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলে উঠল, তিনি পুত্রককে কঠোর শাস্তি দেবার জন্য উদ্যত হ'লেন। পুত্রক তাতে বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না, তিনি তখনই খড়ম পায়ে সকলের নাগালের বাইরে আকাশে উঠে গেলেন। সবাই ও কাণ্ড দেখে অবাক্।

মুহূর্তের মাঝে পুত্রক পাটলীর ঘরে গিয়ে বললেন, আর তোমার এখানে থাকা চলবে না,—আমাদের গোপন সাক্ষাতের কথা রাজার জানা হয়ে গেছে। এস, শীগ্‌গির এস, এখানে থাকলে আমাদের দুইজনের জীবনই বিপন্ন।

পাটলী তখনই রাজী হয়ে গেল। পুত্রক তখন পাটলীকে কোলে ক'রে খড়ম পায়ে আকাশে উঠে দ্রুত চলতে লাগলেন। যেতে যেতে গঙ্গাতীরে একটা সুন্দর জায়গায় এসে তারা হাজির

হ'লেন। সেখানে থালার সাহায্যে নিজেদের খুশিমতো খাবার আনিয়ে খেয়েদেয়ে পুত্রক সেই লাঠির সাহায্যে মাটিতে লিখতে লাগলেন; এই সাম্রাজ্যে যত প্রদেশ আছে—সৈন্য-সামন্ত, প্রজা আছে সে সব আমার হ'ক,—আর এই জায়গাটা হ'ক তার রাজধানী। লাঠির লেখার গুণে তখনই তাই হয়ে গেল। পুত্রক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হ'লেন।

পাটলীর সঙ্গে পুত্রক এখানে নেমেছিলেন ব'লে জায়গাটার নাম হ'ল তখন থেকে পাটলীপুত্র।

কপালস্ফোটের উপাখ্যান

অনেকদিন আগের কথা।

কালিন্দী নদীর তীরে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। নাম ছিল তাঁর গোবিন্দস্বামী। সবদিক দিয়েই তিনি বেশ উঁচুদরের লোক ছিলেন। দুটি ছেলে তাঁর—আশোক দত্ত আর বিজয় দত্ত। তারাও বাপের মতো গুণবান। স্ত্রী আর পুত্রদের নিয়ে বেশ সুখেই কাল কাটাচ্ছিলেন গোবিন্দস্বামী। কিন্তু সুখ বুঝি চিরকাল কারো ভাগ্যেই জোটে না। দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। অন্ন কিছুতেই জোটাতে না পেরে দেশের লোকেরা সব স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে যে-যার মতো যে-কোন দেশে সরে পড়তে লাগল। গোবিন্দ-স্বামীও দেশান্তরে যাওয়াই ঠিক করলেন। ব্রাহ্মণী যুক্তি দিলেন কাশীধামেই চলো, মা অন্নপূর্ণার এলেকায় অন্নের অভাব হবে না। গোবিন্দস্বামী স্ত্রীর যুক্তিই মেনে নিলেন। দেশের জমিজমা-বসত বাড়ি সব আত্মীয়-স্বজনকে দান ক'রে স্ত্রী আর পুত্র দুইটি নিয়ে তিনি বারাণসীর দিকেই রওয়ানা হ'লেন।

পথে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখেন—ভস্মমাখা জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী বসে রয়েছেন। তাঁকে দেখলে বেশ ভক্তি হয়। গোবিন্দস্বামী তাঁকে প্রণাম ক'রে নিজের পুত্র দুইটির শুভাশুভ জিজ্ঞাসা করলেন। সন্ন্যাসী ছেলে দুইটিকে দেখে বললেন, ঠাকুর, আপনার দুটি পুত্রই জীবনে খুব সুখী হবে, কিন্তু আপনার কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে কিছুকালের জন্য আপনার বিয়োগ ঘটবে তবে জ্যেষ্ঠ পুত্রের গুণে আবার আপনি তাকে ফিরে পাবেন। সাধুপুরুষের

ভবিষ্যদ্বাণী শুনে যেমন সুখী হ'লেন, তেমনি দুঃখও বেশ একটু লাগল, ছোটকে কিছুদিনের মতো হরাতে হবে ভেবে। যাই হ'ক নানা কথা ভাবতে ভাবতে অবশেষে তাঁরা কাশীতে এসে হাজির হ'লেন এবং এসে চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরের কাছে নিজেদের আস্তানা করলেন। কিছুদিন পর বিদেশ থেকে আরও অনেক লোক এসে ওখানে বাস করতে লাগল।

একদিন রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে আছে এমন সময় বিজয় দত্ত তার বাপকে জাগিয়ে বললে, বাবা, আমার যে শীত করছে, ভীষণ জ্বর এসেছে আমার, হাড়ে কাঁপুনি ধরে গেছে, কিছুতেই কমছে না। দেখুন ত বাবা, বাইরে থেকে কিছু কাঠ এনে একটু আগুন জ্বালতে পারেন কি-না, নইলে মলুম ত আমি!

বাপ দুঃখের সঙ্গে উত্তর দিলেন, কাঠ কোথায় পাব, বাবা, রাত্রি এখন তৃতীয় প্রহর, সবাই ঘুমিয়ে, কেউ কি জাগবে আমার ডাকে।

ছেলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে বললে, বাবা, আমি আর পারছি না। ঐ—ঐ যে একটু দূরে আগুন জ্বলছে আপনি আমার হাত ধরে আমায় ঐখানে নিয়ে চলুন না—দেখি কাঁপুনিটা যদি একটু কমে!

বাপ বললেন, ও যে শ্মশান, শ্মশানের আগুন ও, চিতার আগুন —ভয়ংকর সব পিশাচ ওখানে ঘোরাফেরা করে, তুমি ছেলেমানুষ, তোমাকে কি ওখানে নিয়ে যাওয়া চলে?

ছেলে বাপের কথায় কিছুমাত্র ভীত না হয়ে বলল—এ সব পিশাচ-টিশাচ আমি মানি না, ভয় করি না। নিয়ে চলুন আমায় শীগ্‌গির, আর দেরি করবেন না।

গোবিন্দস্বামী পুত্র বিজয়দত্তকে কিছুতেই থামাতে না পেরে অবশেষে বাধ্য হয়ে তাকে শ্মশানে নিয়ে এলেন। ছেলে এসেই একটা জ্বলন্ত চিতার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের গা-টাকে একটু তাতিয়ে

নিতে লাগল। কাঁপুনি একটু থামলে সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা, চিতার আগুনের মাঝে পুড়ছে ও জিনিসটা কি ?

বাবা বললেন, ওতে একটা মরা মানুষের মাথা পুড়ছে।

শুনে বিজয়দত্ত কি ভেবে চিতা থেকে একটা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে মাথাটায় একটা ঘা মারলে। সঙ্গে সঙ্গে মরার মাথা থেকে কিছুটা রক্ত ছিটকে এসে লাগল বিজয়দত্তের নাকে-মুখে। মরার বসার গন্ধ নাকে যেতে এবং স্বাদ কিছুটা মুখে যেতে, বিজয়দত্ত তখনই ভীষণাকার এক রাক্ষসে পরিণত হয়ে গেল। মস্তবড় এক বিশ্বগ্রাসী জিভ বেরিয়ে পড়লো, গায়ের চামড়া ঝুল ঝুল করতে লাগল। শুধু তাই নয়, সেই নতুন রাক্ষস তখন এক তলোয়ার হাতে গোবিন্দস্বামীকেই হত্যা করতে উদ্যত হ'ল। গোবিন্দস্বামী ভয় পেয়ে ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগলেন। এই সময় আকাশ থেকে কে যেন বলে উঠলেন, রাক্ষস, নিজের বাপকে তুমি মেরো না।

আকাশবাণী শুনবার পর রাক্ষস বাপকে আর না মেরে দ্রুতপদে অন্য কোথাও চলে গেল।

অদ্ভুত ব্যাপার! গোবিন্দস্বামী পুত্রকে হারিয়ে শ্মশানে থেকেই বেশ কিছুক্ষণ কাঁদলেন, তারপর কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে এসে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা নিজের স্ত্রীর কাছে খুলে বলায় তিনিও কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁদের কাঁদতে দেখে চণ্ডিকা মন্দিরে যারা পূজা দিতে এসেছিল তারাও কাছে এসে সমবেদনা জানাতে লাগল।

এই সময় চণ্ডিকা দেবীর মন্দিরে পূজা দিতে এলেন একজন ধনাঢ্য বণিক, নাম তাঁর সমুদ্রদত্ত। সমুদ্রদত্ত প্রথমে এঁদের কান্না শুনে, পরে কাছে এসে এঁদের সমুদয় বৃত্তান্ত শুনে বিশেষ অভিভূত হলেন। এবং দয়াপরবশ হয়ে স্ত্রীপুত্র সহ গোবিন্দস্বামীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

গোবিন্দস্বামীর ক্রমে মনে পড়ে গেল জটাজূটধারী সন্ন্যাসীর মুখে

শোনা সেই পুত্র বিচ্ছেদের কথা। আবার মিলন হবে—সঙ্গে সঙ্গে সে কথাও। শান্ত হ'ল পুত্রশোক। সমুদ্রদত্তের বাড়িতে—তাঁর যত্নে বেশ সুখেই বাস করতে লাগলেন গোবিন্দস্বামী স্ত্রীপুত্র নিয়ে।

গোবিন্দস্বামীর বড় ছেলে অশোকদত্ত বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানাশাস্ত্র এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে লাগলেন। বাহুযুদ্ধে, মল্লযুদ্ধে তিনি এমন পারদর্শিতা লাভ করলেন যে, ও তল্লাটে তাঁর আর কেউ সমকক্ষ রইলো না।

এই সময় এক দেবোৎসব উপলক্ষ্যে দাক্ষিণাত্য থেকে এক মল্ল এসে হাজির হ'ল কাশীধামে। মল্ল এসেই বলে 'যুদ্ধং দেহি।' কাশীর নাম করা মল্লেরা একে একে হেরে গেল সব এই নবাগত মল্লের কাছে। কাশীর রাজা প্রতাপমুকুটের লজ্জা এবং ক্ষোভের সীমা রইলো না। দিনরাত তিনি ভাবতে লাগলেন—দাক্ষিণাত্যের মল্লকে হারিয়ে কি ক'রে কাশীর মান রক্ষা করা যায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল তাঁর অশোকদত্তের কথা, ডেকে পাঠালেন তাঁকে। অশোকদত্ত এলে রাজার সামনেই দুইজনের যুদ্ধের ব্যবস্থা হ'ল। বহুক্ষণ যুদ্ধ চললো। অবশেষে অশোকদত্তের কাছে রীতিমত পরাজয় স্বীকার করলে দাক্ষিণাত্যের মল্ল। রাজার মন খুশিতে ভরে উঠল, কাশীর মান রক্ষা করেছেন অশোকদত্ত। বলিহারি অশোকদত্ত! এর পর অশোকদত্তকে তিনি নিজের দেহরক্ষী সহচর ক'রে নিলেন। অশোকদত্ত রাজবাড়িতে থেকে রাজভোগে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করতে লাগলেন।

রাজা তাঁকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। যেখানে যান সেইখানেই অশোকদত্তকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যান। একবার শিবচতুর্দশীর দিন রাজা নগরের বাইরে গেলেন শিবপূজা করতে। সঙ্গে অশোকদত্ত। পূজা সেরে মহাশ্মশানের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন রাজা, এমন সময় শুনতে পেলেন কে যেন কাতরকণ্ঠে চিৎকার ক'রে বলছে,—মহারাজ, বিচারপতির আদেশে বিনা

অপরাধে আমাকে শূলে দেওয়া হয়েছে। আজ তিনদিন হয়ে গেল তবু এ পাপ প্রাণ দেহ ছেড়ে বেরুচ্ছে না। তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে গেল, একটু জল দেবার লোক কাছে নেই। আপনি যদি দয়া করে আমার মুখে জল দিয়ে যান!

শ্মশান থেকে এই আর্তরব শুনে রাজা অশোকদত্তকে বললেন, অশোক, তুমি ঐ লোকটির মুখে একটু জল দেবার ব্যবস্থা ক'রে এসো ত, বড় কষ্ট পাচ্ছে লোকটা। অশোকও আর কারো সাহায্য না নিয়ে কিছু জল সংগ্রহ ক'রে নিজেই শ্মশানের মাঝে এগিয়ে গেলেন। রাজা আর অপেক্ষা না ক'রে নিজের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন।

অশোকদত্ত সেই অন্ধকার রাত্রে মহাশ্মশানের মাঝে গিয়ে দেখলেন কোথাও শিয়ালের দল নরমাংস খাবার লোভে ছুটাছুটি করছে, কোথাও চিতা জ্বলছে, কোথাও প্রমত্ত শিয়ালেরা নরকঙ্কাল হাতে নাচানাচি করছে, কোথাও বেতাল আর ভৈরবের দল হাততালি দিয়ে হৈ হৈ করে নাচছে।

এসব দেখেও অশোকদত্ত বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে জোর গলায় ডেকে বলতে লাগলেন, কে কোথা থেকে রাজার কাছে তেষ্টার জল চাইলে উত্তর দাও, আমি তোমার জন্য জল নিয়ে এসেছি।

একটা চিতার কাছাকাছি জায়গা থেকে উত্তর এল, এই যে আমি এখানে।

শব্দ অনুসরণ ক'রে এগিয়ে গিয়ে অশোকদত্ত দেখলেন একটা জ্বলন্ত চিতার পাশে একটা শূল, তাতে বিদ্ধ হয়ে রয়েছে সেই তৃষ্ণার্ত লোকটি, আর শূলের নিচে ব'সে অঝোরে কাঁদছে এক সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী। অশোকদত্ত সেই স্ত্রীলোকটিকে ওখানে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন, মা, তুমি কে, এখানে ব'সে এমন ক'রে কাঁদছই বা কেন?

স্ত্রীলোকটি উত্তর করলে, বাবা, আমি বড় হতভাগিনী, যাকে



শূলের নিচে বসে অঝোরে কাঁদছে এক সর্বাঙ্গসুন্দরী নারী।

শূলে দেওয়া হয়েছে আমি ওঁর স্ত্রী, আমি ওঁর সঙ্গে চিতারোহণ করব বলে এখানে অপেক্ষা করছি, কিন্তু তিনদিন হয়ে গেল, কিছুতেই ওঁর প্রাণ বেরুচ্ছে না। তৃষ্ণার্ত হয়ে উনি সেই কখন থেকে জল চাইছেন—জল আমি এনেওছিলাম কিন্তু ওঁর মুখ এত উঁচুতে যে সেখানে আমার হাত পৌঁছাচ্ছে না।

শুনে অশোকের মনটা একেবারে শ্রদ্ধা এবং করুণায় গলে গেল। তিনি স্ত্রীলোকটিকে বললেন, মা, রাজা আমাকে জল আনতে বলায় আমিও তোমার স্বামীর জন্য জল এনেছি। তুমি এক কাজ কর: আমার কাঁধে উঠে ওঁর মুখে জল দাও। পরপুরুষ ব'লে আমাকে ছুঁতে তুমি কিছুমাত্র সংকোচ করো না,—কারণ আপদ কালে পরপুরুষ ছুঁতে দোষ নেই, তা ছাড়া, আমি ত তোমায় মা ব'লে ডেকেছি—আমি তোমার সন্তান।

স্ত্রীলোকটি অশোকদত্তের কথায় রাজী হয়ে শূলবিদ্ধ তৃষ্ণার্তের মুখে জল দিবার জন্যে কিছুটা জল হাতে তাঁর কাঁধে চড়ল। অশোক-দত্ত—স্ত্রীলোকের স্বামী-পরিচর্যা দেখা সঙ্গত নয় মনে করে নিজের মুখটা নিচের দিকে করে রাখলেন। স্ত্রীলোকটি কি করছে তা তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। কিছুক্ষণ কেটে গেল,—তবুও স্ত্রী-লোকটির কোন নামবার লক্ষণ দেখা যায় না। ব্যাপার কি ভাবছেন এমন সময় কয়েক ফোঁটা উষ্ণ রক্ত তাঁর গায়ে এসে পড়ল। রক্ত দেখে শিউরে উঠে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেন স্ত্রীলোকটি একটি ধারাল ছুরি দিয়ে শূলবিদ্ধ লোকটির গা থেকে মাংস কেটে কেটে খেয়ে যাচ্ছে। অশোকদত্ত ব্যাপার দেখেই বুঝতে পারলেন মেয়েটি রাক্ষসী, তাই তখনই তাকে এক ঝাকি দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার নূপুর-পরা পা চেপে ধরলেন। রাক্ষসী জোরে টানাটানি ক'রে তার পা অশোকদত্তের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত আকাশ পথে উধাও হয়ে গেল বটে, কিন্তু তার পায়ের একটা নূপুর অশোকদত্তের হাতেই রয়ে গেল। এইবার অশোকদত্তের নজর

পড়ল সেই নূপুরের দিকে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন তিনি নূপুরের দিকে ঃ এমন সুন্দর কারুকার্য করা রত্নখচিত নূপুর কোনদিন তাঁর চোখে পড়েনি, শুধু তাই নয়, মর্ত্যবাসী কেউ হয়ত চোখেও দেখে নি। মনে ক্ষোভও হ'তে লাগল তাঁর; আরেকটা নূপুরও কেন কেড়ে রাখলাম না। এমনি ক'রে নূপুরের কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি রাজবাড়িতে ফিরে এলেন। সকালে রাজা প্রতাপমুকুট অশোকদত্তকে আসতে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, অশোক, কাল রাত্রে শ্মশানে তুমি যাকে তৃষ্ণার জল দিতে গেলে—তার খবর কি বলো?

অশোকদত্ত সে কথায় কোন উত্তর না দিয়ে সেই অপূর্ব রত্ন-নূপুরটি রাজার হাতে তুলে দিলেন।

রাজা সেই অপরূপ নূপুর দেখে রীতিমত বিস্মিত হয়ে বলে উঠলেন—এ কি, অশোক, এমন অপূর্ব জিনিস তুমি কোত্থেকে যোগাড় করলে, আর আনলে ত একখানাই বা আনলে কেন?

অশোকদত্ত তখন গত রাত্রের সমস্ত ঘটনা রাজার কাছে আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলেন। শুনে, অশোকদত্তের সাহস, বীরত্ব এবং গুণপনার কথা স্মরণ করে রাজার চিত্ত তাঁর উপর আরও স্নেহশীল হয়ে উঠলো। তিনি নূপুরটি হাতে ক'রে তখনই অন্তঃপুরে গিয়ে রাণীর হাতে তা দিয়ে অশোক কি ক'রে এটা লাভ করেছে সে বৃত্তান্ত রাণীর কাছে সব খুলে বললেন। শুনে রাণীও অশোক দত্তকে অনেক প্রশংসা করতে লাগলেন।

রাজা সেই সুযোগে বললেন, দেখ, আমার একটা কথা মনে হচ্ছে।

রাণী জিজ্ঞাসু নেত্রে চাইলেন।

রাজা বললেন—জাতি, বিদ্যা, বিনয়, বীরত্ব, সত্য ব্যবহার এই সব দিয়ে বিচার ক'রে আমার মনে হয়, অশোকদত্তের মতো লোক

জগতে সত্যি দুর্লভ। আমাদের কন্যা মদনলেখার সঙ্গে এর বিয়ে দিলে কেমন হয় ?

রাণী শুনে উল্লসিত হয়ে বললেন—খুব ভালো হয়। আমিও কথাটা আপনাকে বলবো বলবো ভাবছিলাম, কারণ অশোক শুধু আমাদের কন্যা মদনলেখার যোগ্য ব'লে নয়, আমি মেয়ের হাবভাবে বুঝতে পেরেছি সেও মনে-প্রাণে ওকে পতিরূপে পাবার কামনা করে। সুতরাং শীগ্‌গিরই 'আপনি অশোককে এ বিবাহে রাজী করান। তাছাড়া গত রাত্রে আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, দেখলাম একজন বর্ষীয়সী মহিলা এসে আমায় বলছেনঃ বাছা, তুমি মদনলেখার বিয়ের জন্য ভেবো না। ওকে অশোকদত্তের হাতেই দাও—অশোকই ওর পূর্ব জন্মের স্বামী।

অশোকদত্তকে এ বিবাহে রাজী করাতে রাজার কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। অসুবিধা হ'লও না। অশোককে রাজী করাবার পর ভালো দিন দেখে তার সঙ্গে রাজকন্যা মদনলেখার বেশ জাঁকজমকের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। রাজার জামাই-মেয়ে বেশ সুখেই কাল কাটাতে লাগলেন।

একদিন হঠাৎ রাণী রাজাকে বললেন, অশোক যে নূপুরটা এনে দিয়েছে, সেটা আমার বড় পছন্দ, অমনটি কই কোথাও ত আর দেখিনি, কিন্তু ওর জুড়ির অভাবে ওটা আর ব্যবহার করা যাচ্ছে না। ওর জুড়িটা তৈরি করা যায় না ?

রাজা রাণীর মনের অভিলাষ বুঝে তখনই নগরের স্বর্ণকারদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তাদের বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এই নূপুরের জুড়ি তৈরি ক'রে দিতে পার বলো, তাকে আমি বানির সঙ্গে পুরস্কারও দেব।

স্বর্ণকারদের সবাই নূপুরটি বেশ ভালো ক'রে দেখলে, দেখে বললে, মহারাজ, এ শিল্পসৌন্দর্য সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই, যেখান থেকে এ অপূর্ব জিনিসটি জোগাড় করেছেন

সেখানে খোঁজ ক'রে দেখুন, হয়ত মিলে যাবে এর জুড়ি। রাজা স্বর্ণকারদের কথায় বিশেষ ভাবনায় পড়ে গেলেন।

রাজার চিন্তার কারণ বুঝে অশোকদত্ত বললেন, মহারাজ, আপনি অত ভাববেন না, আমিই আপনাকে এর জুড়ি নূপুরটি এনে দেব।

অশোকদত্তের কথা শুনে রাজা বড় খুশি হ'লেন বটে, কিন্তু ভাবনায়ও একটু পড়ে গেলেন: অশোক এখন শুধু আমার প্রিয় সহচর নয়, প্রাণাধিক জামাই। নূপুরের খোঁজে সে আবার ঐ ভীষণ শ্মশানে যাবে!

বীর অশোককে কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না। রাজা-রাণীর মনঃস্তুষ্টির জন্যে আগের আনা নূপুরটি হাতে ক'রে গভীর রাত্রে তিনি সেই মহাশ্মশানে ঢুকলেন। ঢুকে দেখলেন আগের দিনের মতোই সেখানে বেতাল পিশাচ আর ভূতপ্রেতের ছুটাছুটি। এদের খুশি করতে না পারলে ত তার কার্যসিদ্ধি হবে না। ভাবতে লাগলেন তিনি,—নরমাংস না হ'লে ত এদের খুশি করা যাবে না,—নরমাংস আমি এখন কোথায় পাই!

নিরুৎসাহ না হয়ে বীর অশোকদত্ত খুঁজতে লাগলেন মানুষের মৃতদেহ। খুঁজতে খুঁজতে দেখেন একটা গাছের ডালে গলায় দড়ি বাঁধা একটা মৃতদেহ ঝুলছে। অশোক তখনই গাছ থেকে শবটা নামিয়ে তার গলায় বাঁধা দড়ি ধরে সেটা মাটিতে টানতে টানতে নিয়ে চললেন। সঙ্গে সঙ্গে ফেরী-ওয়ালাদের মতো চিৎকার করে বলতে লাগলেন, তোমরা কে মরা মানুষের দেহ কিনতে চাও,—এস, প্রচুর মাংস পাবে এতে।

এমনি ক'রে দুই একবার ডাকবার পরই কে যেন একটু দূর থেকে ব'লে উঠলো, আমার কাছে নিয়ে আসুন ত!

কণ্ঠস্বর শুনেই অশোকদত্ত বুঝলেন এ কোন্ স্ত্রীলোক ডাকছে। দেখা যাক—যার নূপুর ছিনিয়ে নিয়েছিলাম আমি, এ সেই কিনা!

স্ত্রীলোকটি যেখান থেকে ডেকেছিল সেখানে এগিয়ে গিয়ে তিনি দেখেন,—হ্যাঁ সে-ই,—সঙ্গে আরও কয়েকটি স্ত্রীলোক আছে এবার। ওরা সবাই নিশ্চয় ওরই মতো রাক্ষসী, তবু তাদের কাছে গিয়ে একটুও ভয় করল না অশোকের।

অশোক স্ত্রীলোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—কই, কে নেবে শব?

এই যে আমি। কতো দাম দিতে হবে এর?

দাম! অশোক তখন নূপুরটি তাকে দেখিয়ে বলল, দাম হচ্ছে এই নূপুরের জুড়ি নূপুরটি, দিতে পার, পাবে শব,—নইলে না।

স্ত্রীলোকটি তখন মৃদু হেসে বললে, যে নূপুরটি দেখালেন আপনি ও আমারই নূপুর,—ওর জুড়িটিও আমারই কাছে আছে। আমিও আপনার অপরিচিত নই,—আপনিও আমার অপরিচিত নন, সুতরাং এ অবস্থায় আর শব বিক্রী ক'রে আমার কাছ থেকে আপনার নূপুর সংগ্রহ করতে হবে না, যদি আপনি আমার কথা শোনেন।

অশোকদত্ত উত্তর দিলেন, তুমি যদি আমায় আর একটা নূপুর দেবার প্রতিশ্রুতি দাও—তাহলে তোমার যে-কোন কথা আমি শুনতে রাজি আছি।

স্ত্রীলোকটি বললে, আমি আপনাকে আমার সমস্ত কথা খুলে বলছি, তাতেই আপনি আমার পরিচয় এবং অভিপ্রায় বুঝতে পারবেন। এখান থেকে অনেক দূরে হিমালয়ের শিখরে ত্রিঘণ্ট নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে আমার স্বামী লম্বজিহ্ব বাস করতেন। আমার নাম বিদ্যুৎশিখা, তাঁর একমাত্র কামরূপিণী ভার্যা। আমি ইচ্ছা করলে যে-কোন মূর্তি ধারণ করতে পারি। আর আমার সামনে এই যে মেয়েটি দেখছেন এটি আমার একমাত্র সন্তান, প্রাণাধিক প্রিয়। আমার স্বামী অনেক দিন হ'ল কপালস্ফোট নামে এক রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করে মারা গেছেন। কপালস্ফোট কিন্তু আমাদের উপর

কিছুমাত্র অত্যাচার করেনি, সে আমাদের সুন্দর বাড়িটাতেই থাকতে দিয়েছে। আমরা সেখানে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই আছি। স্বামী আমার নেই, মেয়ে বড় হয়েছে—বিবাহযোগ্যা হয়েছে। এখন একটা উপযুক্ত বর খুঁজে এর বিয়ে দেওয়া দরকার। ওর বরের খোঁজেই আমি ওকে সঙ্গে ক'রে শ্মশানে শ্মশানে ঘুরে বেড়াই। সেদিন শ্মশানে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সময় থেকেই আমার মনে হয়েছে আপনিই ওর উপযুক্ত বর। আমি ইচ্ছা করেই সেদিন আমার একটা নূপুর আপনার হাতে রেখে গিয়েছিলাম, জানতাম আর একটা নূপুরের লোভে আপনি অবশ্যই আবার এ শ্মশানে আসবেন, আবার আমার সঙ্গে দেখা হবে। আজ আপনি এসেছেন দেখে আমি বড় খুশি হয়েছি, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার মেয়ে বিদ্যুৎপ্রভাকে বিয়ে করলে আমি আরও খুশি হব, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমার মেয়েকে বিয়ে করলে আমি আপনাকে অন্য নূপুরটি দেব।

আর একটা নূপুর তাঁকে নিতেই হবে সুতরাং অশোকদত্ত তখনই স্ত্রীলোকটির কথায় রাজী হয়ে গেলেন। বিদ্যুৎশিখা তখন আকাশপথে অতি অল্পসময়ের মাঝে অশোকদত্তকে নিয়ে হিমালয় শিখরে কালঘণ্টপুরে এসে হাজির হ'ল, সঙ্গে কন্যা। অশোকদত্ত সেখানে এসে অপূর্ব রাক্ষসপুরী দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন। অশোকদত্তকে কয়েকদিন বেশ যত্নের সঙ্গে পরিচর্যা করবার পর বিদ্যুৎশিখা তার কন্যা বিদ্যুৎপ্রভাকে তাঁর হাতে সমর্পণ করলে। অশোকদত্ত রাক্ষসপুরীতে তাঁর নূতন স্ত্রী বিদ্যুৎপ্রভার সঙ্গে কিছুকাল সুখে কাটাবার পর তাঁর শাশুড়ীকে বললেন, মা, আপনার কথামতো আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছি—এবার আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখুন। অপর নূপুরটি আমায় দিন, আমি তা নিয়ে এখন বারাণসী যেতে চাই।

বিদ্যুৎশিখা তখনই তার প্রতিশ্রুতি রাখল: অপর নূপুরটি

তাঁর হাতে এনে দিল, শুধু তাই নয়, তার সঙ্গে একটা স্বর্ণকমলও জামাইকে উপহার দিল। অশোকদত্ত মহাখুশি হয়ে তাকে বললেন, মা, আপনি আমার জন্ম চিন্তিত হবেন না, মাঝে মাঝে আমি এখানে এসে আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব।

বিদ্যুৎশিখা জামাইয়ের কথা শুনে খুশি হয়ে তাঁকে আকাশ-পথে বারাণসীর সেই মহাশ্মশানে এনে পৌঁছে দিলে। যাবার সময় একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ব'লে গেল, বাবা অশোক, আমি প্রতি কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রে এই শ্মশানে আসি, তুমি মাঝে মাঝে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।

অশোক তাঁর শাশুড়ী বিদ্যুৎশিখার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরের দিকে রওয়ানা হ'লেন। বাপ গোবিন্দস্বামী একে ত ছোট ছেলেটিকে হারিয়েছেন—বড় ছেলেটিকেও এতোদিন না দেখে বড় মনঃকষ্টে ছিলেন। অশোকও এতোদিন পরে বারাণসীতে ফিরেছেন, বাপ-মায়ের জন্মে তাঁর মন কেমন করতে লাগল—তাই নূপুর আর স্বর্ণকমল নিয়ে প্রথমে রাজবাড়িতে না গিয়ে বাপের ওখানেই উঠলেন। এদিকে রাজা প্রতাপমুকুটও দীর্ঘকাল অশোককে না দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে কিছুটা খবর জানবার জন্মে এবং কিছুটা অশোকের মা-বাপকে সান্ত্বনা দেবার জন্মে সেই সময় বেহাই-বাড়ি এসে হাজির। অশোক প্রথমে বাপ-মা পরে শ্বশুরের পাদবন্দনা করে নিজের কুশলবার্তা তাঁদের জানালেন—তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন।

কুশল আদান-প্রদান শেষ হ'লে অশোক সেই নূপুর এবং স্বর্ণকমলটি রাজার হাতে তুলে দিলেন। রাজা নূপুরের সঙ্গে সেই অপূর্ব স্বর্ণকমলটি পেয়ে বিস্মিত হয়ে বললেন—বাবা অশোক, তুমি এই অপূর্ব জিনিসটি কোথেকে যোগাড় করলে?

অশোক তখন ঐ দ্বিতীয় নূপুর ও স্বর্ণকমল লাভের সমস্ত

ঘটনা আদ্যোপান্ত বিবৃত করলেন। শুনে বাপ ও শ্বশুরের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। মুগ্ধ রাজা তখনই জামাইকে নিয়ে রাজভবনে এসে নতুন আনা নূপুর এবং সোনার পদ্মটি রাণীকে দেখালেন। রাণীও মহাখুশি।

সোনার কমলটি বড্ড ভালো লেগেছিল রাজার, তাই সময় পেলেই ওটা বের ক'রে নেড়েচেড়ে দেখতেন। কিন্তু এটাকে কোথায় রাখা যায়?—কোথায় রাখলে আরও ভালো দেখায়?—রাজভবনের সামনে যে দেবমন্দিরটি ছিল—তার উপরে বসানো ছিল রূপোর কলস। অনেক ভেবে-চিন্তে সোনার পদ্মটি রাজা তার উপর রাখলেন। বড় সুন্দর দেখাতে লাগল—চমৎকার! কিন্তু একটা মুশকিলও হ'ল,—মন্দিরের উপরে আছে দুটো রূপোর কলস, তার একটাতে স্বর্ণকমল শোভা পাচ্ছে, আর একটা যে খালিই রইল, আর একটা স্বর্ণকমল না হ'লে মানাচ্ছে না।

রাজা ঐ দিকে তাকান,—আর বসে বসে ভাবেন। রাজার রকম-সকম দেখে বুদ্ধিমান অশোকদত্তের বুঝতে বাকী রইল না রাজার অভিলাষ। তিনি একদিন রাজাকে ঐ অবস্থায় দেখে বললেন—মহারাজ, আদেশ করেন ত আর একটা স্বর্ণকমলও আমি আপনাকে এনে দিতে পারি।

রাজা বললেন—না বাবা, আর তোমার এমন দুঃসাহস ক'রে কাজ নেই।

অশোকদত্ত মুখে আর এর কোন জবাব দিলেন না বটে, কিন্তু নীরবে অপেক্ষা করতে লাগলেন কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রির। ঐ রাত্রি এলে তিনি সকলের অজ্ঞাতে আবার সেই মহাশ্মশানে গিয়ে হাজির হলেন। তাঁর শাশুড়ী বিদ্যুৎশিখার সে রাত্রে ওখানে আসবার কথা। অশোক গিয়ে দেখেন তাঁর শাশুড়ী বিদ্যুৎশিখা সেখানে এসে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। প্রথমে দু'জনার কুশলবার্তা বিনিময় হ'ল, তারপর অশোক রাজী আছেন জেনে

বিদ্যুৎশিখা তাঁকে হিমালয়ের উপরে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। কন্যা বিদ্যুৎপ্রভা অনেকদিন পর স্বামীকে পেয়ে বড় খুশি।

অশোকদত্তের বেশ কিছুদিন ওখানে সুখেই কেটে গেল। এর পর একদিন তিনি শাশুড়ীকে বললেন—মা, আপনি আমায় কিছুদিন আগে একটা স্বর্ণকমল দিয়েছিলেন, মনে আছে ?

মনে থাকবে না ?

—আমাকে অমনি আর একটা দিতে হবে যে !

বিদ্যুৎশিখা বললে, বাবা, আর একটা আমি কোথায় পাব ? আর ত নেই আমার। রাক্ষস কপালস্ফোটের একটা দীঘি আছে—তাতে অমনি অনেক স্বর্ণকমল ফোটে, এখনও অনেক ফুটে আছে। সেই একবার আমাকে একটিমাত্র উপহার দিয়েছিল, সেটা ত তোমাকে আমি দিয়েই দিয়েছি—আর পাব কোথায় ?

শুনে অশোকদত্ত একটু ভেবে বললেন—বেশ, আপনার কাছে যদি আর না থাকে তবে সেই দীঘিটাই আমায় দেখিয়ে দিন।

বিদ্যুৎশিখা শুনে আঁৎকে উঠে বললে—বাব্বা—সেখানে তুমি যাবে ! এমন সাহস করো না বাবা,—ভয়ংকর সব রাক্ষস সব সময় সেই দীঘি পাহারা দিচ্ছে। সেখানে কি কোন মানুষ যেতে পারে ?

পারে কি না—সে আমি দেখব, আপনি একবার আমায় দেখিয়ে দিন না।

বিদ্যুৎশিখা কিছুতেই সাহস পায় না, অথচ অশোকদত্ত এদিকে নাছোড়বান্দা। অবশেষে বিদ্যুৎশিখা দূর থেকেই আঙুল দিয়ে কপালস্ফোটের দীঘিটা দেখিয়ে দিল। অশোকদত্ত অমনি সেদিকে ছুটলো। তারপর সেখানে গিয়ে পটাপট স্বর্ণকমল তুলতে শুরু ক'রে দিলে।

একজন মানুষ এসে দীঘি থেকে স্বর্ণকমল তুলছে দেখে প্রহরী রাক্ষসেরা অমনি 'রা রা' ক'রে ছুটে এলো তাঁকে ধরতে, মারতে।

কিন্তু একজন মানুষকে ধরা মারা যত সহজ তারা মনে করেছিল, এসে দেখে তত সহজ ত নয়ই—বরং সম্ভবই কি না সন্দেহ। অশোকদত্ত ছেলেবেলা থেকে মল্লবিদ্যা চর্চা ক'রে এখন কাশীর সর্বশ্রেষ্ঠ মল্লবীর। এক একটা রাক্ষস তাঁকে ধরতে আসে অমনি পলক ফেলতে না ফেলতে কুস্তির প্যাঁচে তাকে কাৎ করেন। দেখতে না দেখতে বহু রাক্ষস তাঁর হাতে মারা গেল। অনেকগুলি জখম হয়ে কাতরাতে কাতরাতে দলপতি কপালস্ফোটের কাছে ছুটে গেল খবরটা দিতে। মানুষের দুঃসাহসের কথা শুনে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে কপালস্ফোট ছুটে এলো মানুষটাকে সায়েস্তা করতে। কিন্তু এ কি! মানুষটাকে দেখবামাত্র তার সমস্ত রাগ যে একেবারে জল হয়ে গেল: এ যে তার দাদা অশোকদত্ত!

কপালস্ফোট অস্ত্র নিয়ে এসেছিল মানুষকে মারতে—এবার সে অস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে ছুটে গিয়ে অশোকদত্তকে প্রণাম ক'রে বললে—দাদা, আমায় চিনতে পারো? চিনতে পারবে না, আমি যে এখন রাক্ষস হয়ে গেছি,—আমি তোমার ছোট ভাই বিজয়, বিজয়দত্ত। মহাত্মা গোবিন্দস্বামী আমার বাবা। দুর্দৈববশতঃ একদিন বাবার সঙ্গে শ্মশানে যেতে হয়েছিল আমার,—সেখানে এক মড়ার মাথার বসা আমার নাকে-মুখে পড়ায় আমি রাক্ষস হয়ে গিয়েছিলাম। এখন তোমাকে দেখামাত্র আমার রাক্ষসত্ব ঘুচে গিয়ে আবার আমি মানুষ হ'লাম।

দেখতে না দেখতে অবশ্য রাক্ষস কপালস্ফোট তখন মানুষ বিজয়দত্ত হয়ে গেছে। অশোকদত্ত এতদিন পরে ছোট ভাই বিজয়-দত্তকে সামনে পেয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। দুই ভাইয়ের চোখেই আনন্দাশ্রু।

এরপর দুই ভাই নিজেদের সুখদুঃখের কথা বলছেন এমন সময় স্বর্গ থেকে এক দিব্যসুন্দর মূর্তি তাদের সামনে এসে হাজির হ'লেন।

কে আপনি?

আমি বিদ্যাধরগুরু কৌশিক।

প্রণাম করলেন দুই ভাই ঃ আজ্ঞা করুন!

কৌশিক স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললেন, আজ্ঞা আর কিছু নয়, আমি তোমাদের বলতে এসেছি, তোমরা এর আগের জন্মে বিদ্যাধর ছিলে, শাপগ্রস্ত হয়ে মানুষ হয়ে জন্মেছিলে। এবার শাপমুক্তি হ'ল তোমাদের। আমার কাছ থেকে নিজেদের বিদ্যা নিয়ে নিজের নিজের আবাসে যাও।

গুরুর কাছ থেকে বিদ্যালাভ ক'রে দুই ভাই তখনই বিদ্যাধর-দেহ প্রাপ্ত হ'লেন। এরপর দীঘি থেকে নিজেদের খুশিমত স্বর্ণকমল তুলে নিয়ে আকাশপথে কালঘণ্টপুরে এসে হাজির হ'লেন। অশোকের রাক্ষসী স্ত্রী বিদ্যুৎপ্রভা থাকে সেখানে। বিদ্যুৎপ্রভাও আর জন্মে বিদ্যাধরী ছিল, অভিশাপে রাক্ষসের মেয়ে হয়ে জন্মেছিল। স্বামী বিদ্যাধর-দেহপ্রাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে—এর মাঝে সে-ও বিদ্যাধরী হয়ে গেছে। দুই ভাই তখন বিদ্যুৎপ্রভাকে নিয়ে তখনই আকাশপথে বারাণসীতে এসে হাজির হ'লেন।

দুই ভাই এসে যখন তাঁদের বাপ-মাকে প্রণাম করলেন তখন তাঁদের দেখে বাপ-মায়ের আনন্দের সীমা রইল না,—বিশেষ ক'রে ছোট ছেলে বিজয়কে ত অনেকদিন পরে ফিরে পেয়েছেন। আনন্দে গোবিন্দস্বামী আর তাঁর স্ত্রীর চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

এদিকে জামাই অশোকদত্তের আগমন-বার্তা রাজার কানে পৌঁছে যেতেই তিনি বেয়াই গোবিন্দস্বামীর বাড়িতে এসে হাজির হ'লেন। অশোক তাঁর পাদবন্দনা ক'রে নিজের আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত তাঁকে নিবেদন করলেন। রাজা সব শুনে খুশি হয়ে অশোকের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়-স্বজন সবাইকে সমাদরে নিজের বাড়ি নিয়ে এলেন।

অশোকের আগমন উপলক্ষে রাজবাড়িতে একটা উৎসবের আয়োজন করা হ'ল। অশোক এবার তাঁর আনা স্বর্ণপদ্মগুলি

শ্বশুরের হাতে তুলে দিলেন। রাজা মহাখুশি। এদিকে উৎসব চলতে লাগল রাজবাড়িতে—শুধু একদিন নয়—দিনের পর দিন।

একদিন সবাই বসে আছেন এমন সময় গোবিন্দস্বামী বিজয়-দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা বাবা, তুমি সেদিন শ্মশানে হঠাৎ রাক্ষস হয়ে গেলে তা ত চোখেই দেখলাম, তারপর কি কি ঘটল, বলো না আমাদের—বড় শুনতে ইচ্ছা করছে।

বিজয় বললে—মড়ার বসা নাকে মুখে লেগে আমি রাক্ষস হয়ে গেলাম, তা ত আপনি নিজের চোখেই দেখলেন। এর পরে রাক্ষসেরা আমায় নিজের দলে ডাকতে লাগল। আমি তাদের কাছে গেলে তারা আমায় হিমালয়ে তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা আমাকে দেখেই তাঁর সেনাপতি ক'রে দিলেন। নাম হ'ল আমার কপালস্ফোট।

কিছুদিন এমনি কাটবার পর রাক্ষসরাজ গন্ধর্বদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা পড়লেন। রাক্ষসেরা তখন আমাকেই রাজা ক'রে সিংহাসনে বসালে। এরপর দাদা একদিন আমার দীঘিতে স্বর্ণকমল তুলতে এলে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে আমি মানুষ হয়ে গেলাম। এর পর আমরা দু'জন শাপমুক্ত হয়ে আমাদের পূর্বজন্মের বিদ্যালাভ করলাম।

বিজয় যখন এই সব বলে অশোকদত্ত তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিজয় তাঁর দিকে চেয়ে বললে—দাদা, আমাদের পূর্বজন্মের বৃত্তান্তটা তুমি বলো না?

অশোক বললেন—বলছি, সংক্ষেপে বলছি: পূর্বজন্মে আমরা দুই ভাই বিদ্যাধর ছিলাম। একদিন গালব মুনির আশ্রমের কাছ দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় দেখি কয়েক জন মুনিকন্যা পাশেই গঙ্গায় স্নান করছে। তাদের দেখে আমাদের মন আকৃষ্ট হ'ল। অভিভাবক মুনিরা আমাদের অসঙ্গত অনুরাগ দেখে কুপিত হয়ে আমাদের যে অভিশাপ দিলেন তারই ফলে আমাদের মানুষ হয়ে

জন্মাতে হ'ল। সেইদিনই সেই মুনিদের মুখেই আমরা শুনে নিলাম, আমাদের দুইভাইয়ের বিচ্ছেদ হবে, আবার মিলনের সময় শাপমুক্তি ঘটবে। এখন তাই ঘটেছে। এখন আমরা বিদ্যাধর—শুধু বাপ-মায়ের চরণ দর্শন করতে আমাদের এখানে আসা।

এই কথা শুনবার পর এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল : গোবিন্দস্বামী, তাঁর ব্রাহ্মণী এবং অশোকদত্তের প্রথমা স্ত্রী রাজকন্যা মদনলেখাও বিদ্যাধরত্ব প্রাপ্ত হ'লেন।

তখন এঁরা সবাই আকাশপথে বিদ্যাধরলোকে এসে হাজির হ'লেন। সেখানে এসে অশোকদত্তের নাম হ'ল অশোক বেগ,—বিজয়দত্ত হলেন বিজয় বেগ।

গোবিন্দকূট নামে একটা সুন্দর পর্বতে তাঁরা পরম সুখে বাস করতে লাগলেন।

এদিকে রাজা প্রতাপমুকুট—সব দেখে শুনে বড় খুশি। অশোকের মতো সর্বগুণধর শাপভ্রষ্ট বিদ্যাধরের হাতে তিনি মেয়ে দিতে পেরেছেন এ কি কম ভাগ্যের কথা!

কীর্তিসেনার উপাখ্যান

পাটলীপুত্র নগরের ধনপালিত বণিকের মেয়ে কীর্তিসেনা। ধনপালিতের ঐ একটিই মেয়ে। মেয়েটি যেন একটি রত্ন—যেমনি রূপে তেমনি গুণে। বাপ বড্ড ভালবাসেন তাকে। আদুরে মেয়েকে একটা ভাল বিয়ে দিতে হবে ত। ধনপালিত তাই অনেকদিন ধরে জামাই খুঁজছেন। খুঁজে খুঁজে শেষে একটা ভাল ছেলে পেয়েও গেলেন: মগধের এক নামকরা বণিক-বংশের একটি ছেলে—নাম দেবসেন। বংশের ঐ একই ছেলে, ভাই-বোন কিছু নেই। বাপও নেই, শুধু মা আছেন। খবর নিয়ে যা বুঝলেন ধনপালিত তাতে ছেলেটি ধনে-মানে, কুলে-শীলে নিজের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। সুতরাং পরম খুশিমনে, পরম নিশ্চিন্তে দেবসেনের সঙ্গে মেয়ে কীর্তিসেনার বিয়ে দিয়ে দিলেন—ভাবলেন, আশা করলেন, মেয়ে খুবই সুখে থাকবে।

কিন্তু ধনপালিতের আশা মিটল না। এমন দেবোপম স্বামী পেয়েও স্বামীর ঘরে এসে সুখী হ'তে পারল না কীর্তিসেনা। শাশুড়ী বড় দজ্জাল, বড় মন্দ। ধনপালিত ছেলেরই সব কিছুর খোঁজ করেছিলেন, ছেলের মায়ের কথা আর ভাবেননি, তাই মেয়ের এমন দুর্গতি। এমন দেবীতুল্য বউ তবু শাশুড়ী তার নামে বিষ ছড়ান দিনরাত। শুধু বউকে সামনে পেয়ে তার মুখের উপরই নয়—পাড়াপড়শীর সঙ্গে দেখা হ'লে তাদের কাছেও বউয়ের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।

সব কানে আসে কীর্তিসেনার। নিদারুণ ব্যথা পায়, নীরবে নিরালায় বসে কাঁদে, নিজের স্বামীর কাছে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে না। ভাবে—ব'লে লাভ কি, শুনে শুধু দুঃখ পাবেন ছাড়া ত আর কিছু নয়।

এ-ব্রত কিন্তু রাখতে পারলে না কীর্তিসেনা শেষ পর্যন্ত। স্বামী বাণিজ্য করতে বল্লভীপুর যাচ্ছেন। দেবসেন এ-কথা স্ত্রীর কাছে বলার সঙ্গে সঙ্গে কীর্তিসেনা কেঁদে ফেটে পড়ল: আমি থাকব কি ক'রে? তুমি দুঃখ পাবে ব'লে এতদিন বলিনি; তোমার মা আমায় যাচ্ছেতাই ক'রে গালাগালি দেন, দোষ না করলেও দোষ খুঁজে বের করেন, ছুতোর অভাব হয় না—পাড়াপড়শীদের দেখলেই তাদের কাছে আমার নিন্দা। এতদিন তুমি কাছে ছিলে, তোমার মুখ চেয়ে আমি সব সইতাম। তুমি চলে গেলে আমি থাকবো কি ক'রে? তোমার কাছে সব খুলে বললাম, এখন তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো।

দেবসেন স্ত্রীর কাছে সব শুনে মনে দুঃখ পেলেন খুবই, কিন্তু কটুভাষিণী মাকে কিছুই বললেন না বরং তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললেন—মা, আমি বাণিজ্য করতে বল্লভীপুরে যাচ্ছি, বউ রইল, তুমি তাকে দেখো, নিজের মেয়ের মতো একটু স্নেহ-যত্ন করো।

কীর্তিসেনা তখন স্বামীর সঙ্গে শাশুড়ীর সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। শাশুড়ী ছেলের কথার উত্তরে বললেন—বাবা, মায়ের কাছে ছেলে তফাৎ নয়, তুমি আজ এ-কথা আমায় বলতে এসেছ? বউকে তোমার চেয়ে আমি বেশি যত্ন ক'রে থাকি।

কীর্তিসেনা শাশুড়ীর কথা শুনে শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল, মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুল না তার।

বলা বাহুল্য, ছেলে বিদেশ যাবার সঙ্গে সঙ্গে শাশুড়ী আবার নিজমূর্তি ধারণ করলেন। শুধু নিজমূর্তি বললে ভুল হয়—

মূর্তি এবার সাবেক মূর্তির চেয়ে আরও ভয়ংকর হ'ল। এবার আর শুধু মুখের কটূকাব্যি নয়—মাঝে মাঝে বউয়ের গায়ে হাতও উঠতে লাগল। দুর্জনের কখনও ছলের অভাব হয় না। বউকে নির্যাতন ক'রে যেন আশ মেটে না শাশুড়ীর, তাই বাড়ির এক ঝিকে দিয়ে প্রহার করালেন কীর্তিসেনাকে। কীর্তিসেনা কোন উচ্চবাচ্য করে না, নিরালায় অশ্রু বিসর্জন করে আর স্বামীর ধ্যান করে। বউটিকে কিছুতেই ধৈর্যচ্যুত করা যাচ্ছে না দেখে শাশুড়ীর যেন জিদ বেড়ে যায়। শেষে একদিন নিজে হাতে আচ্ছা ক'রে কয়েক ঘা বসিয়ে একটা আঁধার ঘরে আটকে রাখলেন কীর্তিসেনাকে।

এইবার যেন মনের ক্ষোভ মিটল শাশুড়ীর। গায়ের জ্বালা কমলো, কারণ কীর্তিসেনা এবার বেদম মার খেয়ে অন্ধকার ঘরে একলা পড়ে ধৈর্য হারিয়ে কাঁদতে শুরু করেছে।

কেমন জব্দ, এবার ঠেলা বোঝ!—এবার কয়েক দিন না খাইয়ে রাখতে পারলেই তুমি অক্কা পাবে—ছেলে ফিরে এলে বলবো : বউ তোর অসুখ হয়ে মারা গেছে,—শাশুড়ী মনে মনে এমনি ক'রে বলেন আর ভাবেন—আর দিলটা তাঁর খুশি হয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কি ভেবে বউকে একেবারে না খাইয়ে মেরে ফেলা আর ঠিক মনে করলেন না, সারা দিনরাতের মধ্যে একবার যৎসামান্য খাবার আর জল তার ঘরে পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

কীর্তিসেনা বড় ঘরের মেয়ে, আজন্ম পরমসুখে লালিত-পালিত হয়েছে, এখন এই আঁধার ঘরে প্রায়-অনাহারে দিন কাটাতে গিয়ে তার দমটা যেন প্রতিক্ষণে বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। সে অবিরত চোখের জল ফেলে আর ভাবে : মেয়ে হয়ে জন্মানোই বুঝি বিধাতার একটা অভিশাপ—নইলে এমন বাপের ঘরে জন্মে, এমন দেবতুল্য স্বামীর হাতে পড়েও আমার

এ দুর্দশা হবে কেন? কিন্তু এ যে আমি কিছুতেই আর সহ্য করতে পারছি না। এখন আমার মরণ হ'লেই বাঁচতাম। মরণ সত্যি আমার কাম্য, কিন্তু স্বামী যে আমার বিদেশে—একবার তাঁর চরণ দর্শন না ক'রে এ পোড়া প্রাণটাও যে বিসর্জন দিতে চায় না আমার মন। তা হ'লে?—কি করি আমি, কি করি? এ ভীষণ করাগার থেকে যেমন ক'রে হ'ক আজ রাত্রে আমি বের হবই। কিন্তু তারপর?—তারপর কোথায় যাব আমি? বাপের বাড়ি?—না, তা কিছুতেই নয়—আমার স্বামী বল্লভীপুর গেছেন, যেতে হয় তো আমি সেখানেই যাব। কিন্তু এই অন্ধকার বদ্ধ কারাগার থেকে আমি বেরুব কেমন ক'রে? দেখা যাক্!

কীর্তিসেনা একটা উপায় বের করতে অন্ধকারেই সেই ঘরটার এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগল, হাতড়াতে লাগল। হঠাৎ কি একটা হাতে ঠেকতেই সেটা তুলে দেখে একটা খোন্তার মতো কি? তাই দিয়েই মাটি খুঁড়ে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করল সে। হ্যাঁ,—এখন এই পথেই বাইরে বেরুনো যাবে। তারপর বুদ্ধি ক'রে গায়ের অলংকারগুলি খুলে আঁচলে বেঁধে পুরুষের বেশ—এক রাজপুত্রের বেশ ধারণ করলে সে। তখন রাত্রি। সেই রাত্রেই পথ চলে সকালে এক দোকান ঘরের সামনে হাজির হ'ল সে। তারপর দোকানে ঢুকে দোকানদারের কাছে একখানা অলংকার বিক্রী করে, তাকে কিছু দিয়ে তার বাড়িতেই রইল, খেল। বাকী টাকা সে আঁচলে বেঁধে রাখল।

সেদিন রাত্রি সেখানেই কেটে গেল। পরদিন সকালে শুনতে পেল সমুদ্রসেন নামে এক বণিক বাণিজ্য করবার জন্য বল্লভীপুর যাচ্ছেন। শুনে তখনই তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে পরিচয় ক'রে কীর্তিসেনা তাঁর সাথী হবার আকাঙ্ক্ষা জানালে। সমুদ্রসেন পুরুষবেশী কীর্তিসেনার চেহারা দেখে মনে করলেন—এ কোন সম্ভ্রান্ত রাজবংশের ছেলে হবে, সুতরাং তখনই তিনি রাজী হয়ে গেলেন।

সমুদ্রসেনের সঙ্গে অনেক বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রী ছিল। প্রকাশ্য পথে যেতে হ'লে বল্লভীপুর অনেক দূর পড়ে, তাই তাড়াতাড়ি সেখানে যাবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি এক অরণ্যপথ ধরলেন। মনে করেছিলেন সন্ধ্যার আগেই তিনি বনটা পার হ'তে পারবেন, কিন্তু তা আর কিছুতেই হয়ে উঠল না, মাঝ অরণ্যে থাকবার সময়ই রাত্রি এসে গেল। চারিদিকে গাছের ছায়া থাকায় বনটা রীতিমতো অন্ধকার হয়ে উঠল। তাছাড়া, নানারকমের ভয়ংকর শব্দঃ কোথাও পেঁচা ডাকছে, কোথাও বাঘ-শেয়াল-নেকড়ের ডাক—কোথাও পাতার উপর সাপ-পোকা-মাকড়ের গা-ছমছমানো সড়সড়। শুধু কি এই! বনের মাঝে সবচেয়ে বড় ভয় দস্যু-তস্করের—বিশেষ ক'রে বণিকদের কাছে। সমুদ্রসেন ছাড়া আরও অনেক বণিক যাচ্ছিলেন এই অরণ্যপথে। তাঁরা সবাই ভয় পেয়ে গেছেন। বণিকরা সব একত্র হয়ে একটা সুবিধামতো জায়গা বেছে নিয়ে সেইখানে রাত্রি যাপন করবেন ঠিক করলেন। চোর-ডাকাতের হাত থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য সবাই সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র এনেছিলেন। বাণিজ্যদ্রব্য মাঝে রেখে বণিকের দল অস্ত্র হাতে তার চারিদিক ঘিরে বসলেন। কারো চোখেই ঘুম নেই—কখন কি ঘটে বলা ত যায় না!

এদিকে কীর্তিসেনা এই অবস্থা দেখে ভাবছে আর ভাবছেঃ কি দশা হ'ল আমার—কি করলাম! এক বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে আর এক বিপদে এসে পড়লাম! এখন আমি কি করি? এই বনের মাঝে ডাকাতের হাতে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহলে আসল কথা কি, আমার স্বামী জানতে পারবেন না। ভাববেন আমি কুলে কালি দিয়েছি। সবার চেয়ে বড় ভয় কেউ যদি আমায় স্ত্রীলোক বলে চিনতে পারে। তখন কি আমার ধর্মরক্ষা করা সম্ভব হবে? স্ত্রীলোকের সবচেয়ে বড় জিনিসই যে ধর্ম—সতীত্ব! প্রাণ যায় সে-ও স্বীকার, তবু ধর্ম

রক্ষা করতেই হবে। যাই হ'ক এদের কাছাকাছি থাকা আর আমার কর্তব্য নয়,—দেখা যা'ক খুঁজে-পেতে কোন নিরাপদ জায়গা পাওয়া যায় কি না!

কীর্তিসেনা এই সব ভেবে তখনই বণিকদের কাছ থেকে সরে গিয়ে এদিক-ওদিক খুঁজে বেড়াতে লাগল। ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। কিছুক্ষণ খোঁজার পরই কীর্তিসেনা দেখে সামনে মস্তবড় এক গাছ, তাতে মস্তবড় এক খোঁড়ল। যাক বাঁচা গেল, কীর্তিসেনা সেই গাছের খোঁড়লের মাঝে ঢুকে গাছের বড় বড় পাতা দিয়ে ওর মুখ বন্ধ ক'রে দিল। এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত।

ওখানে থেকে ঘুম আর এল না কীর্তিসেনার চোখে, মনে মনে শুধু স্বামীর চরণ চিন্তা করতে লাগল। রাত্রি গভীর হ'তে থাকল, চারিদিক যেন আরও থমথমে, ভয়ংকর, বনের জানোয়ারেরাও যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে 'হারে রে রে' করতে করতে ডাকাতের দল এসে পড়ল বাণিজ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করতে। বণিকরাও অল্পে ছেড়ে দেবে না, তারাও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, শোনা যেতে লাগল শুধু মার-মার, কাট-কাট আর অস্ত্রের ঝনঝনানি। গাছের খোঁড়লের মাঝে কীর্তিসেনার গা শিউরে শিউরে উঠতে লাগল।

ওখানে থেকেই সে লোকের চিৎকার আর কথাবার্তায় বুঝতে লাগল যুদ্ধে বণিকেরা হেরে যাচ্ছে, দস্যুরা ওদের মেরে ধরে, ওদের সর্বস্ব লুণ্ঠন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। সকাল হ'লে দেখা গেল সত্যিই তাই: বণিকরা কেউ আর বড় বেঁচে নেই, সমুদ্রসেন সপরিবারে নিহত, বাণিজ্যদ্রব্যের কোন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, শিবিরের ওখানটায় শুধু জমাট রক্ত আর মৃতদেহ। সঙ্গীদের এই দশা দেখে মনটা পুড়ে যেতে লাগল তার, হাজার হ'লেও স্ত্রীলোকের মন ত! কিন্তু শুধু মন পুড়লেই ত চলবে

না, আত্মরক্ষা করা চাই, নিজের পথ দেখা চাই। এখানে থাকা আর নিরাপদ নয় মনে ক'রে বনপথের ধারে গাছের আড়ালে আড়ালে সে চলতে থাকল। একটু অন্যমনস্ক হয়েই চলছিল বুঝি—হঠাৎ সামনে চোখ পড়তেই দেখে দণ্ডকমণ্ডলুধারী প্রশান্তমূর্তি এক সন্ন্যাসী।

কীর্তিসেনা তাঁকে প্রণাম করলে সন্ন্যাসী তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে তার পরিচয় এবং এই বিজন অরণ্যে আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। কীর্তিসেনা সন্ন্যাসীর কাছে আর কোন কথা লুকাল না, সব খুলেই বললে।

সন্ন্যাসী তাঁর কমণ্ডলু থেকে কিছুটা জল দিলেন তাকে খেতে, তারপর বল্লভীনগরের পথ বলে দিয়ে তখনই সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন।

সন্ন্যাসী চলে গেলে কীর্তিসেনা সন্ন্যাসীর দেওয়া জল পান করবার সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব দূর হয়ে গেল। তারপর সন্ন্যাসীনির্দিষ্ট পথে সে যাত্রা শুরু করল। সারাদিন চলার পর সন্ধ্যা হলেই সে আবার এক বনের মাঝে এসে পড়ল। আবার সেই রাত্রি কাটাবার সমস্যা। খুঁজতে খুঁজতে এবারও এক তরুকোটর মিলে গেল। নিজে তার মাঝে থেকে কয়েকটা কাঠ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করলে।

একটু পরেই ভয়ংকর এক রাক্ষসী এল সেখানে, সঙ্গে তার কয়েকটা বাচ্চা। রাক্ষসী কোটরের ফাঁক দিয়ে কীর্তিসেনার দিকে তাকাতে লাগল। তা দেখে কীর্তিসেনার ত একেবারে 'হয়ে' গেছে। নিজের মৃত্যু আসন্ন জেনে সে মনে মনে ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগল। রাক্ষসী কিন্তু তাকে কিছু বললে না, তার বাচ্চাগুলি নিয়ে সে শুধু ঐ গাছে চড়ল।

বাচ্চাগুলি বলতে লাগল, মা, বড় খিদে পেয়েছে যে, আমরা খাব কি, কিছু খেতে দে

রাক্ষসী বললে, তাই ত রে, কি দেব তোদের, তোদের খাবার জোগাড় করতে আজ আমি মহাশ্মশানে গিয়েছিলাম, সেখানে ত কিছু জুটল না। ডাকিনীদের কাছে চাইলাম, তারাও কিছু দিতে পারলে না। শেষে ভগবান ভৈরবের কাছে গেলে—তিনি বললেন, তাই ত, তুমি মহাবংশের মেয়ে, তোমাকে কিছু দিতে পারলেই ত হ'ত। তা তুমি—এক কাজ কর, তুমি বসুদত্তনগরে যাও। সেখানকার রাজার নাম বসুদত্ত। বড় ভাল রাজা, প্রজাদের অনেক উপকার করেছেন তিনি। এখন তিনি অসুস্থ। এ বনটা তাঁর। এখানে একদিন শিকার করতে এসে অনেক ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত হয়ে এক জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, তখন একটা কৃমিকীট তার কানের মাঝে ঢোকে। সেটা আর বের করতে পারেননি তিনি। সেই কৃমি অনেক বাচ্চা পেড়ে তাঁর মাথাটা একেবারে জখম করে ফেলেছে। বাঁচবার আর আশা নেই। অনেক চিকিৎসক এসেছে, কেউই রোগ কি তা ধরতে পারেনি, কেউ আর পারবে বলেও মনে হয় না। শীগ্‌গিরই মারা যাবেন রাজা। সেই রাজার শব খেতে পারলে ছ' মাসের মাঝে আর তোমার খিদে থাকবে না। বুঝলি ত, স্বয়ং ভৈরব যখন এই কথা বলেছেন, তখন আর ভাবনা কি, একটু সবুর করে থাক্ তোরা।

বাচ্চারা মায়ের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে বললে, আচ্ছা মা, রাজার অসুখ কিছুতেই সারবার নয় ?

সারবার নয় কেন, রোগ কি তা ধরতে পারলেই চিকিৎসা হতে পারে, আর কিসে সারে তা-ও আমি জানি।

কিসে সারে, বলো না মা, আমাদের !

ছেলেদের আবদার রাখতে বলেই ফেললে রাক্ষসী রাজার মুক্তির উপায়। তরুকোটরে থেকে কীর্তিসেনা তা শুনে ভাবতে লাগল : ভৈরবের কথায় রাজার মৃতদেহ খাবার আশায় রাক্ষসী

এখন আর কারো প্রাণনাশ করবে না বলে মনে হচ্ছে। যাক বাঁচা গেল। আমি যদি এখান থেকে নিরাপদে বেরুতে পারি তাহলে বসুদত্তকে আমি বাঁচাতে পারব। সমুদ্রসেনের কাছে শুনেছি বসুদত্ত না কি খুব ভাল রাজা। বণিকদের কাছ থেকে কম শুল্ক নিয়ে তিনি নিজের রাজ্যে বাণিজ্য করতে দেন। বণিকদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য একটি ভাল পথও নাকি তৈরি করিয়ে দিয়েছেন। আমার স্বামীও হয়তো এই পথেই ফিরবেন। আমি এখন কোন রকমে বসুদত্তের রাজধানীতে যেতে পারলেই তাঁকে আরোগ্য করবার পর ওঁর রাজধানীতে থেকেই স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করব।

এমনি করে ভাবতে ভাবতে রাত্রি কেটে গেল। ভোর হলে কীর্তিসেনা সেই তরুকোটর থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই দেখলে একটি শান্তশিষ্ট রাখাল ছেলে কতকগুলি গরু নিয়ে বন থেকে মাঠের দিকে যাচ্ছে। কীর্তিসেনা তাকে ডেকে বললে, খোকা, শোন।

রাখাল ছেলে ওর মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ায়, এ যে একেবারে রাজপুত্রের মতো চেহারা।

এ জায়গাটা কোন্ জায়গা, খোকা?

ওঃ, তুমি জানো না, তুমি কোত্থেকে এসেছ, এ রাজা বসুদত্তের এলাকা, ঐ, ঐ যে তাঁর রাজধানী দেখা যাচ্ছে। তুমি রাজবাড়িতে যেতে চাও বুঝি? তা আমাদের রাজার ভীষণ অসুখ, বাঁচবেন না বোধহয়, কত কবরেজ-বদ্যি আসছেন, কেউ সারাতে পারছে না।

কীর্তিসেনা বললে, আমায় যদি কেউ রাজার কাছে নিয়ে যায়, আমি তাহলে তাঁকে সারাতে পারি।

রাখাল উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, পারো তুমি, সত্যি পারো? তাহলে এস, আমিই তোমায় রাজবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি।



কীর্তিসেনা রাজার কাছে হাজির হ'ল

রাখাল গরুগুলিকে মাঠে চরতে ছেড়ে দিয়ে পুরুষবেশী কীর্তিসেনাকে পথ দেখিয়ে রাজবাড়ির সামনে নিয়ে হাজির হ'ল। তারপর সেখানকার প্রতিহারীদের সকল কথা খুলে বললে, তারা কীর্তিসেনাকে নিয়ে রাজার কাছে হাজির হ'ল।

রাজার অবস্থা তখন সঙ্গীন। যন্ত্রণায় ছটফট করছেন তিনি। তিনি পাছে বিরক্ত হ'ন, এই ভয়ে কোন লোকজনকেও তাঁর কাছে যেতে দেওয়া হয় না, একমাত্র চিকিৎসক ছাড়া।

কীর্তিসেনা নিজেকে চিকিৎসক বলে পরিচয় দিয়েই রাজার কাছে হাজির হ'ল। পুরুষবেশী কীর্তিসেনার দেবদূতের মতো চেহারা দেখে রাজার মনে আশার সঞ্চার হ'ল। তিনি ক্ষীণস্বরে বললেন, আপনি যদি আমার রোগ সারাতে পারেন, তাহ'লে আমার অর্ধেক রাজ্য আমি আপনাকে দেব।

কীর্তিসেনা রাজাকে আশ্বাস দিয়ে রাক্ষসী যেমন বলেছিল তেমনি ক'রে রাজার চিকিৎসা শুরু করলে। তার চিকিৎসায় রাজা সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুটা আরাম পেলেন। খুশি হয়ে তিনি নবীন চিকিৎসককে সুন্দর একটা নির্জন ঘরে থাকতে দিলেন। কীর্তিসেনা সে রাত্রি সেখানে কাটাবার পর পরদিন সকল লোকের সামনে রাজার কান থেকে বহু কৃমিকীট বের ক'রে ফেললেন। রাজার অসুখ একেবারে সেরে গেল। সবাই ভাবতে লাগল, এ কি দেবতা! চারিদিকে চিকিৎসকের ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

রাজা সুস্থ হয়ে বহুদিন পর স্নানাহার করে বড় খুশি। মনের খুশিতে রাজা এই তরুণ চিকিৎসককে বহুলক্ষ টাকার বস্ত্রালংকার দান করলেন। রাজসভার অমাত্যেরাও মনের আনন্দে কীর্তিসেনাকে বহু অর্থ দান করলেন।

রাজা এবং রাজামাত্যদের কাছ থেকে পাওয়া ধনরত্ন নিয়ে কীর্তিসেনা পুরুষের ছদ্মবেশে বসুদত্তের রাজধানীতে বাস করতে লাগল। এমনিভাবে কিছুদিন কেটে যাবার পর তার ভাগ্য

প্রসন্ন হ'ল। যে উদ্দেশ্যে আসা তা' সিদ্ধ হ'ল। একদিন একদল বণিক বাণিজ্য করতে বসুসেনের রাজধানীতে এসে হাজির হলেন। কীর্তিসেনা দূর থেকেই নিজের স্বামী দেবসেনকে দেখতে পেয়ে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে তাঁর পায়ের উপর পড়ল।

বসুসেন প্রথমে চিনতে না পেরে হকচকিয়ে গেলেন, তারপর যখন চিনতে পারলেন, তখন তাঁর বিস্ময় আর আনন্দের সীমা রইল না। অন্যান্য বণিকেরাও ব্যাপার বুঝছিল না কিছু, সবারই মনে কৌতূহল। সবার কৌতূহল নিবৃত্ত করবার জন্য কীর্তি-সেনাকে তখন আদ্যপান্ত সকল কথাই খুলে বলতে হ'ল।

ক্রমে কীর্তিসেনার সব কথা রাজার কানে গিয়ে পৌঁছুলে রাজা তার ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন। মা স্ত্রীর উপর যা নির্যাতন করেছেন সে কথা স্মরণ করে দেবসেনের মন তার মায়ের উপর রীতিমতো বিরূপ হয়ে উঠল। বসুদত্তনগরের লোকেরা কীর্তিসেনার কাহিনী শুনে তাকে প্রশংসা করতে লাগল, সেইসঙ্গে বলতে লাগল এমন সাধ্বী স্ত্রী যে পুরুষের, তার ভাগ্যের তুলনা নেই, জগতের কোনো কিছুই তাকে কাবু করতে পারে না।

কীর্তিসেনা একে ত রাজার প্রাণদান করেছে, তাছাড়া এত বড় সাধ্বী, তাই নিজের আনন্দ জানাতে তিনি যেন একেবারে দিশে পান না, তিনি আনন্দাতিশয্যে বলে উঠলেন, আজ থেকে এই গুণবতী সাধ্বী আমার বোন। একে যে কি করে খুশি করব তা আমি বুঝতে পারছি না।

কীর্তিসেনা সেখানেই ছিল। রাজার কথা শুনে পরম খুশি হয়ে বললে, মহারাজ, আপনি আগে আমায় যে-সব ধনরত্ন পুরস্কার দিয়েছিলেন সে সব আপনার কাছেই আছে, এখন সেগুলি আমার স্বামীর হাতে তুলে দিলে আমি খুশি হব।

রাজা বসুসেন তখনই সে-সব আনিয়ে কীর্তিসেনার স্বামী দেবসেনের হাতে তুলে দিলেন। তাছাড়া বিশেষ সম্মানসূচক একটা রত্নখচিত পাগড়ি তাঁর মাথায় বেঁধে দিলেন।

দেবসেন রাজার মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে নিজের উপার্জিত অর্থ আর রাজদত্ত ধনরত্ন দিয়ে স্ত্রী কীর্তিসেনার সঙ্গে বসুসেনের রাজধানীতে থেকেই সুখে কাল কাটাতে লাগলেন।

হরিশর্মার উপাখ্যান

হরিশর্মা ব্রাহ্মণ হয়েও ব্রাহ্মণের কাজকর্ম কিছু করতে পারেন না, কারণ জানেন না। ছেলেবেলায় লেখাপড়া করেননি, বড় হয়ে পূজাআর্চাও শেখেননি, তাই বড় গরিব। অথচ ছেলেপিলে অনেকগুলি। কাজকর্ম জানেন না, সুতরাং ভিক্ষা করেই পেটের যোগাড় করতে হয়। আর ভিক্ষা শুধু নিজেই করেন না, ছেলে বউ সবাই করে। এক জায়গায় বেশিদিন ভিক্ষা করতে গেলে ভাল ভিক্ষা মেলে না, তাই নানা জায়গায় ঘুরতে হয় তাঁকে। এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে হরিশর্মা একদিন বউ আর ছেলেদের নিয়ে নগরের শীলদত্ত নামে এক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাড়িতে এসে বললেন, আমরা বড় গরিব ব্রাহ্মণ, একটু আশ্রয় দিন। আমরা অবশ্য বসে বসে আপনার অন্ন ধ্বংস করব না, কাজ করে দেব, যে কাজ বলবেন তাই।

শীলভদ্রের কেমন মায়া লাগল এই অনাহারক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ-পরিবারের দিকে চেয়ে। আশ্রয় দিলেন বাড়িতে। হরিশর্মা আর তাঁর ছেলে-বউয়ের যে-সব কাজের ভার পড়ল, বলা বাহুল্য সে সব কাজ তেমন সম্মানজনক নয়, বাড়িতে দাসদাসীরাই সে-সব কাজ করে থাকে।

এমনি করেই দিন কাটতে লাগল হরিশর্মার পরিবারের।

কিছুদিন পর বাড়িতে এক বিয়ে—শীলভদ্রের মেয়ের বিয়ে। বড় ঘরের মেয়ে, সুতরাং আয়োজন বেশ বড় রকমেরই হতে লাগল। বহু লোকের নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রিতদের পরিতোষ করে

খাওয়ানোর জন্য ভাল ভাল সব খাবার আসতে লাগল। দেখে হরিশর্মা মনে মনে বড় খুশি: এতদিন পরে একটু ভাল ভাল জিনিস খাওয়া যাবে। কিন্তু ভাল জিনিস একটু ভাল করে, বেশি করে খেতে হলে পেটটা একটু আগে থেকে খালি রাখা দরকার! হরিশর্মা তাই ভাল জিনিস ভাল করে খাবার লোভে সপরিবারে সেদিন উপোস করে রইলেন।

মেয়ের বিয়ের পর মহোৎসাহে ভোজের ব্যাপার চলতে লাগল। গৃহস্বামী শীলভদ্র কন্যাপক্ষ এবং বরপক্ষের সকল লোককে আপ্যায়ন ক'রে ডেকে খেতে বসাতে লাগলেন। বাড়ির সবাইকেও ডেকে খাওয়ালেন। হরিশর্মা এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্রের আর ডাক পড়ল না। সারাদিন উপবাস করে আছেন তাঁরা, খিদেয় নাড়ী ছিঁড়ে যাচ্ছে, কিন্তু কই, শীলভদ্র ডাকলেন কই? খিদের কষ্ট ছাড়া এটা একটা অপমানও ত!

রাত্রে নিজের ঘরে শুয়ে দুঃখে-ক্ষোভে তাঁর স্ত্রীকে বলতে লাগলেন—দেখলে, দেখলে ব্যাপারটা, আশ্রয় দিয়েছে বাড়িতে, অথচ খেলাম কি-না তার খোঁজ পর্যন্ত করলে না। আমি গরিব আর মূর্খ বলে এত অবহেলা! আচ্ছা, আমিও মজা দেখাচ্ছি, এমন বুদ্ধি ঠাওরেছি যে, মাথায় করে নাচতে তর সইবে না।

—কি বুদ্ধি ঠাওরেছ, একটু বলোই না গো আমাকে?

—বলছি, কাউকে বলো না যেন: আমি ওর নতুন জামাইয়ের ঐ সুন্দর ঘোড়াটা চুরি করে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখব। সকালে জামাইয়ের ঘোড়া না দেখে যখন খোঁজ খোঁজ রব পড়ে যাবে, অথচ খুঁজে কেউ সন্ধান পাবে না, তখন আমি গণনা করে সন্ধান বলে দেব, দেখি আদর বাড়ে কি-না!

স্ত্রী বললেন—কাজটি একটু সাবধানে করো, কেউ যেন দেখতে না পায়, টের না পায়।

গভীর রাত্রে সবাই ঘুমুলে হরিশর্মা অতি সন্তর্পণে ঘোড়াটি নিয়ে একটু দূরে গিয়ে একটা নিরালা জায়গায় রেখে এলেন। ভোর হলে জামাইয়ের ঘোড়া না দেখে শীলদত্তের বাড়ির লোকেরা সব ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন: বিয়ের ঘোড়া, জামাইয়ের ঘোড়া, কি লজ্জার কথা—খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ।

অনেক খোঁজা হ'ল, অনেকক্ষণ ধরে, সন্ধান আর মিলল না। শীলদত্ত যখন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন, হরিশর্মার ব্রাহ্মণী তখন তাঁর সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, আমি একটা কথা বলতে চাই।

—বলো।

—আমার স্বামী ভাল গণনা করতে জানেন, তাঁকে দিয়ে একবার গণনা করে দেখুন আপনারা—সন্ধান পেয়ে যাবেন!

শীলদত্ত তখনই হরিশর্মাকে ডেকে পাঠালেন, কাছে এলে মুখে একটু আপসোসের সুর এনেই বললেন, ঠাকুর, কাল আমার একটু ত্রুটি হয়ে গেছে, বিয়ের হৈ-চৈতে আপনার তত্ত্বতল্লাস করতে পারিনি, কিছু মনে করবেন না আপনি, শুনলাম আপনি নাকি ভাল গণনা করতে পারেন, আমার জামাইয়ের ঘোড়াটা রাত্রে চুরি হয়ে গেছে। দেখুন ত একবার গুণে-পেতে, কোথায় আছে এখন ঘোড়াটা, কে চুরি করেছে।

হরিশর্মা তখনই মাটির উপর কতকগুলি মিথ্যা রেখা অঙ্কন করে যেন নিবিষ্ট মনে গণনা করতে লাগলেন, তারপর হঠাৎ একবার মুখ তুলে বললেন—হ্যাঁ, পেয়ে গেছি সন্ধান। চোরেরা আপনার জামাইয়ের ঘোড়া চুরি করে সোজা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে, গিয়ে একটা মাঠের ধারে বটগাছের ডালে বেঁধে রেখে পালিয়ে আছে, আজ রাত্রি হলেই আবার সেখান থেকে নিয়ে পালাবে, শীগ্‌গির লোক পাঠান আপনি ঐ দিকে।

শীলদত্তের আদেশে তখনই ছুটল কয়েকজন লোক দক্ষিণ

দিকে ঘোড়া খুঁজতে। একটু পরেই তারা ঘোড়া পেয়ে হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এল। মহাখুশি শীলদত্ত। হরিশর্মার উপর বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মালো এবার শীলদত্তের, বাড়িতে খুব আদর-যত্নেই তাঁকে এবার রেখে দিলেন।

শুধু তাই নয় সমস্ত নগরে তাঁর গণনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, সব জায়গায়ই তাঁর খাতির। হরিশর্মা লোকের কাণ্ডকারখানা দেখেন আর মনে মনে হাসেন: বুদ্ধিটা ঠাওরেছিলাম—তাই!

কিন্তু বেশিদিন তাঁর এ হাসা চলল না। হঠাৎ একদিন ওখানকার রাজবাড়িতে এক চুরি হয়ে গেল, মস্ত বড় চুরি। রাজার লোকেরা কত জায়গায় খোঁজ করে বেড়াল, কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। হরিশর্মার গণনার খ্যাতি আগেই রাজার কানে পৌঁছেছিল, তাই এবার তাঁর ডাক পড়ল।

হরিশর্মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন। এরপর রাজা যখন তাঁকে গণনা করে চোরের পাত্তা দিতে বললেন, তখন তিনি বুদ্ধি করে মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, মহারাজ. আপনার বাড়িতে চুরি সে তো বড় ভয়ংকর কথা, গণনা করে আমি অবশ্য চোর বের করে দিতে পারব, কিন্তু গণনা ত আজ হতে পারে না, মহারাজ, আজ দিনটা তেমন সুবিধের নয়। কাল বেশ ভাল দিন আছে, কাল এসে ঠিক আমি চোর বের করে দেব. আজ আমায় ছুটি দিন, আমি বাড়ি যাই।

হরিশর্মা ভেবেছিলেন আজ এখান থেকে কোন উপায়ে রেহাই পেলে রাত্রেই আমি সপরিবারে এখান থেকে পালিয়ে যাব, তা ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

চতুর রাজা কিন্তু তাঁর এ চালাকিতে ভুললেন না, তিনি তাঁর লোকজনদের হুকুম দিলেন, এঁকে একটা মজবুত ঘরে আজ আটকে রাখ, কাল গণনা ক'রে চোরের সন্ধান দিলে তবে ছাড়া পাবেন।

রাজার লোকজন হরিশর্মাকে একটা ঘরে আটকে রেখে চলে গেলে তিনি অকূল পাথারে পড়লেন। কেবল চিন্তা, আর চিন্তা। চিন্তা আর কি! কেবল নানাভাবে নিজেকে ধিক্কার।

এদিকে রাজবাড়িতে একটা দাসী ছিল, তার নাম জিহ্বা। তার ভাইও ঐ রাজবাড়িতে বাস করত। জিহ্বা অনেক সময় তার ভাইয়ের সঙ্গে যোগসাজশ করে রাজবাড়ি থেকে অনেক জিনিস সরাতো। এটা তার চিরকালের অভ্যাস। অল্প কিছু চুরি গেলে রাজবাড়িতে কেউ আর তা' বড় গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, কিন্তু এবার যে বেশ বড় রকমের চুরিঃ অনেক ধনরত্ন, অলংকার। এবার চুরির মূলে রয়েছে জিহ্বা। সুতরাং জিহ্বার বড় ভয় হয়ে গেছে: এবার আর রক্ষা পাবার উপায় নেই, ব্রাহ্মণ গণক এনেছেন রাজা, গুণে-পেতে ঠিক তিনি বের করে দেবেন। কি করা যায়! ভাবতে লাগল জিহ্বা।

রাত্রি হয়েছে অনেক। ভয়ে জিহ্বার চোখে ঘুম নেই। তার হঠাৎ মনে হ'ল, আচ্ছা, একবার দেখা যাক—গণকঠাকুর এখন কি করছেন, ঘুমিয়ে আছেন, না গণনা করছেন, হঠাৎ যদি কিছু মুখে উচ্চারণ করেন, তা-ও শোনা যাবে।

এই ভেবে জিহ্বা অতি সন্তর্পণে এসে গণকঠাকুরকে যে ঘরে রাখা হয়েছিল তার জানালার ধারে দাঁড়াল।

হরিশর্মার চোখেও ঘুম নেই। কাল সকালে গণনা ক'রে যখন তিনি চোরের নাম-ধাম ঠিকমতো বলতে পারবেন না, তখন তাঁর কি দশা হবে? তিনি ঘরের মাঝে পায়চারি করছেন আর মনে মনে নানা অনুশোচনার বাণী আওড়াচ্ছেন। একথার আবেগ চাপতে না পেরে নিজের জিহ্বাকে তিরস্কার করে তিনি বলেই উঠলেন, জিহ্বা রে, তুই কেন এমন কুকর্ম করলি, কুকর্ম যখন করেছিস তখন তার ফল তোর ভোগ করতেই হবে।

হরিশর্মা অবশ্য নিজের মিথ্যাচারণের জন্যই অনুশোচনা

করছিলেন: শীলদত্তের ওখানে ভালখাবার এবং কৌশলে মান-মর্যাদা পেতে তিনি মিথ্যাকথা বলে নিজেকে গণক বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, আজ বিপদে পড়ে সেই কথা স্মরণ করেই তিনি নিজের জিহ্বাকে তিরস্কার করছেন। কিন্তু দাসী জিহ্বা সে কথা আর বুঝবে কি করে? সে নিজে দোষী, সুতরাং হরিশর্মার মুখে ঐ কথা শুনেই তার মনে হ'তে লাগল,—এই রে, গণকঠাকুর ত গণনা ক'রে এর মাঝেই আমার নাম বের ক'রে জেনেছেন, এখন আমি কি করি, কেমন ক'রে প্রাণ বাঁচাই। দেখি যদি কোনোরকমে ঠাকুরের হাতে-পায়ে ধরে একটু খুশি করতে পারি।

জিহ্বা অনেকক্ষণ ধরে কেবল বসে বসে ভাবলে, তারপর উঠে অনেক চেষ্টায় অনেক কৌশলে হরিশর্মা যে ঘরে আছেন তার দোর খুলে দিয়ে একেবারে ঠাকুরের পায়ের উপর আছড়ে পড়ল।

কি, কি ব্যাপার! হকচকিয়ে উঠলেন হরিশর্মা। দাসী কাঁদতে কাঁদতে বলল—আপনি সর্বজ্ঞ, নইলে এর মাঝেই গণনা ক'রে আমার নাম জানলেন কি ক'রে? আমি—আমিই চুরি করেছি, আমারই নাম জিহ্বা, রাজবাড়ির দাসী আমি। আপনি বাঁচান আমায়, নইলে আমি আপনার পা ছাড়ছি না। আমি আমার হাতের এই দামী অলংকারটি খুলে দিচ্ছি আপনাকে, আপনি আমায় বাঁচান।

হরিশর্মা এবার বুঝতে পেরেছেন সব, তিনি এবার এক নতুন চাল চেলে বললেন,—পাপীয়সি, ভেবেছিস কি? আমি ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণ, কোথায় রেখেছিস্ সেই ধনরত্ন তাই আগে বল্।

জিহ্বা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে, আজ্ঞে ঠাকুর, রাজবাড়ির পশ্চিমে যে বাগানটা—ওর সবচেয়ে বড় ডালিম গাছটার নিচে পুঁতে রেখেছি! দোহাই ঠাকুর, আমার নামটা শুধু বলবেন না, আমার হাতের এই অলংকার আপনার প্রণামী দিচ্ছি।

ধমকে উঠলেন হরিশর্মা, শুধু হাতের অলংকার! যে পাপ

করেছিস তুই, তোর গায়ের সকল অলংকার দিলেও তার প্রায়শ্চিত্ত হয় না।

জিহ্বা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তার গায়ের সকল অলংকারই খুলে দিল হরিশর্মার হাতে, তারপর তাঁর পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললে. দোহাই ঠাকুর, আমার নামটা শুধু বলবেন না।

হরিশর্মা তাকে অভয় দিয়ে বললেন—আচ্ছা, যা, বলবো না তোর নাম—বাঁচিয়ে দেব তোকে।

দাসী চলে গেলে হরিশর্মা আঁধারে বসেই এক চোট নিজের মনে হেসে নিলেন: একেই বলে ভাগ্য! রাখে কেষ্ট মারে কে?—কাল আমার কি দশা হবে ভেবে যখন অস্থির হচ্ছিলাম, নিজের জিহ্বাকে অভিশাপ দিচ্ছিলাম, তখনই বিধাতা আমার সৌভাগ্যের দরজা খুলে দিলেন। গণনা আমি কিছুই জানি না, অথচ এই গণনার খ্যাতি শুনেই রাজা আমায় ডেকে এনেছিলেন, কাল সকালে গণনা করে ওঁর ধনরত্নের সন্ধান দিতে না পারলে আমার কি দশা হ'ত ভাবলেও আমার গা শিউরে ওঠে। চোর নিজে এসে তার পরিচয় দিলে, চোরাই মাল কোথায় আছে তা ব'লে দিলে তাই রক্ষে। যাক, বেচারার নাম আর আমি বলবো না. অনেক টাকার জিনিস দিয়েছে সে আমায়। যেমন ক'রে হ'ক ওকে বাঁচাতেই হবে, নইলে ধর্মে সইবে না।

এমনি ক'রে নানা চিন্তা করতে লাগলেন হরিশর্মা রাত্রি জেগে জেগে। আনন্দে সে রাত্রে আর তাঁর ঘুম হ'ল না। পরের দিন সকালেই রাজা তাঁকে রাজসভায় আনিয়ে বললেন, আজ ত ভাল দিন আছে, বলো ত ঠাকুর গণনা ক'রে আমার বাড়ির চুরির খবর: কে চুরি করেছে, কোথায় আছে সে সব জিনিস?

হরিশর্মা তখন গম্ভীর মুখে মাটিতে নানারকমের আঁচড় কেটে গণনার ভাণ দেখাতে লাগলেন। এমনি ক'রে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে দিয়ে তিনি হঠাৎ মুখ তুলে রাজার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন,

—মহারাজ, চোরেরা আপনার জিনিস বেশি দূর নিয়ে যেতে পারেনি। আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকের বাগানে লুকিয়ে রেখেছে। চোরদের খুঁজলে পাবেন না, তারা এখন আপনার রাজ্য ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে রয়েছে, আবার রাত্রে এসে নেবার চেষ্টা করবে। জিনিসগুলি এখনই আনবার ব্যবস্থা করুন আপনি।

—আমার বাগানের কোথায় রেখেছে, গণনায় তা কিছু তুমি পেলে? সারা বাগান ত আর আমি খোঁড়াতে পারি নে।

—হ্যাঁ, তাও ব'লে দিচ্ছি আপনাকে। আপনার বাগানে সব চেয়ে বড় যে ডালিম গাছটা আছে—তারই নিচে খুঁড়লে পেয়ে যাবেন আপনার সব জিনিস।

রাজার লোকেরা তখনই ছুটল বাগানে, গিয়ে ডালিম গাছের নিচে থেকে সব জিনিস এনে হাজির করল রাজার সামনে।

দেখে রাজা মহা খুশি। হরিশর্মার গণনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে। রাজা বহু সুখ্যাতি করলেন হরিশর্মাকে, তা ছাড়া তাঁর নির্ভুল গণনার পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে দান করলেন কয়েকটি গ্রাম, বাহন, বসন, ভূষণ ও নানা শয্যাদ্রব্য।

এবার হরিশর্মার সব দারিদ্র্য ঘুচে গেল, পরম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে লাগলেন তিনি তাঁর স্ত্রী আর পুত্রদের নিয়ে।

গুণবরার উপাখ্যান

অনেক কাল আগের কথা। বর্ধমানে এক রাজা ছিলেন, নাম ছিল তাঁর বীরবাহু। বীরবাহু বড় ভাল রাজা, বড় ধার্মিক। রাজার একশো স্ত্রী, তার মাঝে গুণবরা নামে স্ত্রীকে তিনি একটু বেশি প্রীতির চক্ষে দেখতেন কারণ গুণবরার সত্যি গুণের অবধি ছিল না।

রাজার মনে মস্ত বড় একটা দুঃখ ছিল: একশো রাণী, অথচ কারোরই কোন সন্তান-সন্ততি হয়নি. সবাই অপুত্রা। সন্তান কামনায় রাজা রাজ্যের বিখ্যাত বৈদ্য শ্রুতবর্ধনকে ডেকে বললেন, তোমাদের আয়ুর্বেদে এমন কোনো ওষুধ নেই যা খাওয়ালে অপুত্রা পুত্রবতী হয়?

—আছে বই কি, মহারাজ, আপনি একটা বন্য ছাগ যোগাড় করুন, আমি ওষুধ তৈরি ক'রে দিচ্ছি, তা খেলেই রাণীদের ছেলে হবে।

রাজাদেশে বন্য ছাগের যোগাড় হ'ল। রাজবৈদ্য তা কেটে নানা ওষুধ মিশিয়ে পাচক দিয়ে পাক করালেন, তারপর তা খেতে ডাকা হ'ল রাণীদের। সব রাণীই এলেন, কিন্তু গুণবরা আসতে পারলেন না, তিনি তখন দেবার্চনায় রত ছিলেন। আর রাণীরা গুণবরার জন্য আর কিছু না রেখে ওষুধ দেওয়া ছাগমাংস সবটাই চেটেচুটে খেয়ে নিলেন।

এদিকে দেবার্চনা শেষ ক'রে গুণবরা এসে দেখেন তাঁর জন্য কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজাও কাণ্ড দেখে মহা বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

বৈদ্য বিশেষ লজ্জিত হয়ে বললেন, আচ্ছা—ঠিক আছে, ছাগলের শিংটা ত আছে—এই দিয়েই ওষুধ তৈরি ক'রে দিচ্ছি আমি। বৈদ্য তখন শিংটার কাৎ ক'রে তাতে ওষুধের গুঁড়ো মিশিয়ে গুণবরাকে খেতে দিলেন।

যথাসময়ে প্রত্যেক রাণীই এক একটি পুত্র সন্তান লাভ করলেন। গুণবরা ওষুধ খেয়েছিলেন সর্বশেষে, তাই তাঁর পুত্র লাভ হ'ল সকলের শেষে। রাজা একশোটি পুত্র লাভ ক'রে পরম খুশি। রাজবাড়িতে মহোৎসব লেগে গেল। যথাসময়ে ছেলেদের নামকরণও হয়ে গেল। গুণবরার ছেলে হয়েছে শিঙের কাথের ওষুধ খাইয়ে, তাই তার নাম রাখা হ'ল শৃঙ্গভুজ।

ছেলেরা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'ল। তাঁরা ক্রমে নানাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠলেন। সর্বকনিষ্ঠ শৃঙ্গভুজ সব কিছুতেই আর সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেন: দেখতে হ'লেন তিনি ঠিক কার্তিকের মতো, পরাক্রমে ভীম, আর ধনুর্বিদ্যায় অর্জুনের মতো। ছোটছেলের এমন রূপগুণ দেখে আর আর ছেলের মায়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে গুণবরাকে কি ক'রে হেয় প্রতিপন্ন করা যায়, একসঙ্গে তারই চক্রান্ত করতে লাগলেন।

অনেক শলাপরামর্শ করবার পর যশোলেখা নামে রাণী আর রাণীদের সঙ্গে নিয়ে একদিন রাজার কাছে গিয়ে জোড় হাত ক'রে দাঁড়ালেন: মহারাজ, অভয় দেন ত একটা কথা বলি।

—বলো।

—বলতে বুক কাঁপছে, কিন্তু না ব'লেও পারছি না। আপনি রাজা, অপরের দোষ নিবারণ করাই আপনার কর্তব্য, কিন্তু নিজের বাড়িতেই যদি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়.তা হ'লে—

—অত ভণিতা না ক'রে ব'লেই ফেল না খোলসা ক'রে—

যশোলেখা তখন রাণী গুণবরা এবং অন্তঃপুর-রক্ষক সুরক্ষিতের নামে এক মহা কলঙ্কের কথা রাজার কর্ণগোচর করলেন।

রাজা কথাটা শুনে প্রথমে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে বসে রইলেন, তারপর আর যে সব রাণী যশোলেখার সঙ্গে এসেছিলেন তাদের একে একে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জানো,—কথাটা কি সত্যি ?

তাদের সবার মুখেই এক কথা, মহারাজ, সত্যি না ত কি—আমাদের নিজের চোখে দেখা।

ওরা সবাই বললেও রাজার কথাটা আদৌ বিশ্বাস হ'ল না, তবু মনে মনে ভাবলেন : কথাটা যখন কানে এল তখন একটা কিছু করা দরকার, নিশ্চিত হওয়া দরকার। রাণীদের তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, আচ্ছা, তোমরা যাও, যা করবার তা আমি করছি।

পরের দিন রাজা সভাসীন হয়ে সর্বজনসমক্ষে সুরক্ষিতকে ডেকে এনে কৃত্রিম ক্রোধ দেখিয়ে বললেন, পাপিষ্ঠ, আমি জানতে পেরেছি, তুই মহাপাপ করেছিস, ব্রহ্মহত্যা করেছিস, তীর্থপর্যটন ক'রে নিষ্পাপ না হওয়া পর্যন্ত আমি তোর মুখদর্শন করব না।

নিষ্পাপ সুরক্ষিত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় ক'রে বললে, মহারাজ আমি শপথ ক'রে বলছি, কোনো পাপ আমি করিনি, মহারাজকে কেউ ভুল সংবাদ দিয়েছে।

রাজা তখনও রাগের ভান ক'রে তাকে ধমকে উঠলেন, আমার সঙ্গে চালাকি ?—যাও, কাশ্মীর রাজ্যে যাও, সেখানে গিয়ে বিজয়ক্ষেত্র, নন্দিক্ষেত্র, বরাহক্ষেত্র এবং আর আর তীর্থস্থান দর্শন করে নিষ্পাপ হয়ে তবে আমার সামনে এসো, তার আগে আমি আর তোমার মুখদর্শন করব না।

সুরক্ষিত নিষ্পাপ হয়েও রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য করে তীর্থভ্রমণে যাত্রা করল।

এরপর রাজা রাণী গুণবরার ঘরে গিয়ে মুখে বিশেষ রাগ, বিরক্তি এবং বিষাদের ভাব এনে একপাশে বসলেন। গুণবরা রাজার মুখের দিকে চেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে বললেন, মহারাজ,

আপনাকে আজ এমন বিমর্ষ, বিরক্ত দেখাচ্ছে কেন, আমি কি শ্রীচরণে কোন অপরাধ করেছি ?

রাজা সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে অনেক চেষ্টায় যেন নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, না, রাণী, তা নয়, একটা মস্ত বড় দুঃখের কারণ ঘটেছে আমার, তাই আজ আমায় এমন দেখছ।

—মহারাজ, আপনার এ মুখ দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আপনার দুঃখের কথা আমায় খুলে বলুন, দেখি আমার কোন সাধ্য আছে কি না দূর করতে।

রাজা তখন কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, রাণী, আজ এই একটু আগে একজন মহাপুরুষ আমার কাছে এসে বললেন, তোমার রাণী গুণবরাকে কিছুকাল মাটির নিচের একটা ঘরে গোপনে রেখে তোমাকে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে থাকতে হবে, নইলে তোমার রাজ্য নাশ।

গুণবরা এতে কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, মহারাজ, এতে যদি আপনার রাজ্য রক্ষা হয় তা হ'লে এখনই আমাকে মাটির নিচের ঘরে নির্বাসিত করুন। এ তো সামান্য কথা, আমার প্রাণ দিলেও যদি আপনার কোনো মঙ্গল হয়, তাতেও আমি রাজী, স্বামী ছাড়া স্ত্রীলোকের আর জগতে কি আছে ?

গুণবরার কথা শুনে রাজার চোখে জল এসে গেল। তিনি নিজের মনে ভাবতে লাগলেন, এমন স্ত্রী কখনও পাপ করতে পারে না। গুণবরা এবং সুরক্ষিত দুইজনই সম্পূর্ণ নিষ্পাপ। বিনা অপরাধে এদের দুজনকে এমন শাস্তি বিধান করতে হচ্ছে, এ আর সহ্য করতে পারছি না আমি। কিন্তু মুখের কথা যখন বলে ফেলেছি তখন পাতালঘরে রাণীকে রাখতেই হবে।

এরপর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রাজা গুণবরাকে মাটির নিচের একটা ঘরে বাস করবার ব্যবস্থা করলেন। গুণবরার মনে কিন্তু

একটুও দুঃখ লাগল না, এতে স্বামীর মঙ্গল হবে ভেবে সেই পাতালপুরীর ঘরেই তিনি স্বর্গসুখে বাস করতে লাগলেন।

শৃঙ্গভুজ মায়ের সেই অবস্থা দেখে ব্যথিত হয়ে রাজার কাছে গিয়ে বললেন, বাবা, আমার মায়ের এ দশা করলেন কেন? রাজা এর কারণ গুণবরার কাছে যা বলেছিলেন ছেলের কাছেও তাই বললেন।

এদিকে যশোলেখা শুধু সতীন গুণবরাকে নির্বাসিত ক'রেই তৃপ্ত হ'তে পারলেন না, সতীনপো শৃঙ্গভুজকেও নির্বাসিত করবার জন্য নিজের পুত্র নির্বাসিতভুজকে উস্কাতে লাগলেন। নির্বাসিতভুজ তার আর আর ভাইদের সঙ্গে যুক্তি করতে লাগল: কি ক'রে তা করা যায়!

সে সময় অগ্নিশিখ নামে এক রাক্ষস বকের মূর্তি ধরে তখনকার লোকদের প্রাণনাশ ক'রে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ একদিন সেই বক রাজবাড়ির ছাদে এসে বসলে এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী রাজকুমারদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বললেন, ঐ যে বকটা দেখছ ও আসলে এক ছদ্মবেশী রাক্ষস, ওকে তোমরা বাণবিদ্ধ ক'রে মেরে ফেল। সন্ন্যাসীর কথা শুনে রাজকুমারেরা তার উপর অসংখ্য তীর ছুঁড়তে লাগলেন, কিন্তু কেউ তাকে বিদ্ধ করতে পারলেন না। এই সময় হঠাৎ শৃঙ্গভুজের দিকে সন্ন্যাসীর নজর পড়তে তিনি ব'লে উঠলেন, আমার মনে হচ্ছে এ-ই পারবে।

শুনে অন্য রাজপুত্রেরা সুখীই হ'ল: এই সুযোগে হয় ত ওকে নির্বাসিত করা যাবে। শৃঙ্গভুজের হাতে তীর-ধনুক ছিল না, তার ভাইয়েরা তখন রাজার সোনার তীর-ধনুক এনে তার হাতে দিয়ে বললে, একবার দেখ ত চেষ্টা ক'রে।

শৃঙ্গভুজ তীর-ধনুক হাতে পেয়ে প্রথমবার তীর ছুঁড়েই বকটাকে বিদ্ধ করলেন। বকটা তীর বিদ্ধ হয়েই সেখান থেকে উড়ে চলে গেল।

নির্বাসিতভুজ তখন সুযোগ পেয়ে অন্যান্য ভাইয়েদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃত্রিম ক্ষোভ দেখিয়ে শৃঙ্গভুজকে তিরস্কার ক'রে বলতে লাগলেন, এ কি কাণ্ড ক'রলে বলো ত, বকটাকে মারতে পারলে না, অথচ সে আমাদের আনা বাবার সোনার তীরটা নিয়ে চলে গেল, এখন বাবাকে আমরা কি বলবো ? ঐ তীর যদি তুমি না এনে দাও ত আমরা সকলে তোমার সামনে আত্মঘাতী হব।

শৃঙ্গভুজ এই কথা শুনে আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সোনার তীর ফিরিয়ে আনতে বক যেদিকে উড়ে গেল সেইদিকে ছুটতে লাগলেন। ভাইয়েরা খুশি হয়ে নিজের নিজের মায়ের কাছে গিয়ে হেসে হেসে যখন এই কথা বলতে লাগলেন, তখন তাঁরা তা শুনে মহাখুশি।

এদিকে বক বাণবিদ্ধ অবস্থায় উড়ে যাবার সময় তার গা থেকে যে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়েছিল তাই দেখে দেখে বকের অনুসরণ ক'রতে লাগলেন শৃঙ্গভুজ। যেতে যেতে তাঁর সামনে পড়ল মস্ত এক বন। বনের মাঝে ঢুকেই দেখে এক নগর। নগরের সামনেই রয়েছে আবার সুন্দর একটি বাগান। শৃঙ্গভুজ একটু বিশ্রাম ক'রে নেবার জন্যে সেই বাগানের একটা গাছের নীচে যেই বসেছেন, অমনি সামনে দেখেন পরম রূপবতী একটি মেয়ে।

শৃঙ্গভুজ বিস্মিত হয়ে মেয়েটির পরিচয় এবং জায়গাটার নাম জিজ্ঞাসা করলে মেয়েটি তাঁর দিকে স্নিগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, আপনি যে নগরে এসেছেন, এর নাম ধূমপুর। অগ্নিশিখ নামে এক রাক্ষস এর অধীশ্বর, আমি তাঁরই কন্যা,—নাম রূপশিখা। সে ত হ'ল,—কিন্তু আপনি কে, কেনই বা এলেন এখানে।

শৃঙ্গভুজ তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমি একটি বককে বাণবিদ্ধ করেছি, বক বাণটি নিয়েই এই দিকে পালিয়ে এসেছে, তারই খোঁজে আমার এখানে আসা।

রূপশিখা রাজপুত্রের কথা শুনে বললে, আপনি যে বকের

কথা বললেন, তিনি আমারই বাবা, অমনি বকের মূর্তি ধরে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ান, কেউ তাঁকে কিছু করতে পারে না, আপনি যখন তাঁকে বাণবিদ্ধ করতে পেরেছেন তখন বুঝতে হবে আপনার মতো ধনুর্ধর আর পৃথিবীতে নেই, আর আমার বাবা যখন আপনার তীরের ঘা খেয়েও বেঁচে আছেন, তখন বুঝে দেখুন, তিনিও আপনার চেয়ে বড় কম ন'ন। বাবা তাঁর গা থেকে আপনার তীরটা টেনে বের ক'রে আহত জায়গায় বিশল্যকরণী লাগিয়ে এখন সুস্থ হয়েছেন।

এই পর্যন্ত ব'লে রূপশিখা নীরব হয়ে কিছুক্ষণ সলজ্জভাবে মাটির দিকে চেয়ে রইল। মেয়েটিকে বড় ভাল লেগেছে শৃঙ্গভুজের।

মেয়েটি কথা বলছে না দেখে শৃঙ্গভুজ নিজেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন, কি ভাবছ তুমি, কথা বলছ না যে!

রূপশিখা মুখ না তুলেই বলল, একটা কথা বলবো, রাগ করবেন না ত?

—না, রাগ করব কেন, বলো।

রূপশিখা মাটির দিকে মুখ রেখেই বললে, আপনাকে আমি আর্যপুত্র ব'লে সম্বোধন ক'রবার অধিকার চাই, আপনার যদি আপত্তি না থাকে ত বলুন, বাবার অনুমতি নিয়ে আসি।

মেয়েটিকে দেখে শৃঙ্গভুজও মুগ্ধ হয়েছেন। বললেন, না, আমার আপত্তি নেই, তুমি তোমার বাবার কাছে যেতে পার।

রূপশিখা তখনই অন্তঃপুরে বাবার কাছে ছুটে গেল, গিয়ে শৃঙ্গভুজের সমস্ত পরিচয় দিয়ে বললে, এর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে না দাও বাবা, তা হ'লে আমি আত্মঘাতিনী হব!

অগ্নিশিখ মেয়ের কথা শুনে একটু গুম হয়ে থেকে বললে, আচ্ছা, একবার তাকে নিয়ে এসো এখানে।

রূপশিখা খুশি হয়ে ছুটে এসে তখনই শৃঙ্গভুজকে হাজির

করল বাপের সামনে। শৃঙ্গভুজ রাক্ষসরাজকে প্রণাম ক'রে দাঁড়ালে রাক্ষসরাজ তাঁকে বললে, রাজপুত্র, তুমি যদি—আমি যা বলবো তাই করতে রাজী থাক তা হ'লে আমি তোমায় আমার এই কন্যা সম্প্রদান করতে পারি।

শৃঙ্গভুজ জানালেন যে, সে রাজী।

রাক্ষস অগ্নিশিখ তখন তাঁকে স্নান ক'রে আসতে বললে এবং মেয়ে রূপশিখাকে বললে, তোমার বোনেদের আমার সামনে ডেকে নিয়ে এসো।

রূপশিখা তখন শৃঙ্গভুজকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললে, একটা কথা আপনাকে আগে থেকেই ব'লে রাখি। আমরা এক শ' বোন, কারোরই বিয়ে হয়নি, দেখতে সবাই এক রকম, একই রকমের পোশাক পরা, সাজগোজ সবারই এক রকম, গলায় একই রকমের হার। বাবা সকলের মাঝ থেকে আমায় বেছে নিতে আপনাকে আদেশ করবেন। আমি আমার হারটা গলায় না পরে আমার মাথার উপর রাখবো, আপনি তাই দেখে চিনে নিয়ে আমার গলায় বনফুলের মালা পরিয়ে দেবেন। বাবার বুদ্ধিটা একটু মোটা, আমাদের কৌশল কিছুই বুঝতে পারবেন না। আর উনি আপনাকে যা-ই করতে বলুন না কেন, তাতেই আপনি রাজী হয়ে যাবেন, তারপর আমার কাছে এসে বললেই আমি সব কিছুর ব্যবস্থা ক'রে দেব।

শৃঙ্গভুজকে এই সব পরামর্শ দিয়ে রূপশিখা তার বোনেদের কাছে গিয়ে তাদের বাপের সামনে নিয়ে গেল, আর এদিকে শৃঙ্গভুজও এর মাঝে স্নান ক'রে অগ্নিশিখের সামনে হাজির হ'ল। অগ্নিশিখ তখন একগাছা বনফুলের মালা তার হাতে দিয়ে বললে, তুমি যে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে তার গলায় এটা পরিয়ে দাও।

শৃঙ্গভুজ মেয়েদের সামনে এগিয়ে গিয়ে পূর্ব সংকেত অনুসারে

যার মাথায় হার দেখলে তার গলায় সে মালা পরিয়ে দিলেন। অগ্নিশিখ তখন বললে, বেশ, কাল সকালে আমি তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব। এখন এসো আমার সঙ্গে।

রাক্ষস মেয়েদের সঙ্গে শৃঙ্গভুজকে অন্তঃপুরে নিয়ে এসে একটু পরে তাঁকে ডেকে বললে, বাড়ির বাইরে ঐ যে ক্ষেতটা দেখা যাচ্ছে ওখানে সাতখারী তিল বুনতে হবে তোমায়, পারবে?

শৃঙ্গভুজ বললেন, পারবো।

তবে যাও, আমি লাঙ্গল, বলদ আর তিল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

শৃঙ্গভুজ তখন রূপশিখার কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বললে, সে বললে, ভয় নেই, মাঠে যাও তুমি, আমি আছি।

মাঠে গিয়ে তিলের পরিমাণ দেখে শৃঙ্গভুজ কিন্তু রীতিমত ভড়কেই গেলেন, রূপশিখা তখন মায়া বলে ক্ষেত চষে তাতে তিল বুনে দিয়ে তাকে নিরুদ্বেগ করলে।

শৃঙ্গভুজ তখন অগ্নিশিখের কাছে গিয়ে বললেন, আর্য, আপনার আদেশ পালন করেছি আমি।

অগ্নিশিখ শুনে গম্ভীর স্বরে বললে, বেশ, যে তিল বুনেছ তুমি আজ, সে সব আবার মাটি থেকে তুলে এক জায়গায় জড়ো কর।

শুনে তখনই ছুটলে আবার শৃঙ্গভুজ রূপশিখার কাছে বলতে। রূপশিখা এসে মায়া বলে, সে কাজটাও মুহূর্তের মাঝে ক'রে দিলে। শৃঙ্গভুজ রাক্ষসের কাছে এসে বললে, আপনার আদেশ পালিত হয়েছে।

অগ্নিশিখ এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বললে, শোন বাপু, এখান থেকে দুই যোজন দক্ষিণে একটা বন আছে তার মাঝে একটা শিবমন্দির আছে, সেখানে আমার ছোট ভাই ধূমশিখ বাস করে, তুমি একদণ্ডের মাঝে সেখানে গিয়ে যদি তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে আসতে পার, তা হ'লে কাল সকালেই রূপশিখাকে আমি তোমার হাতে তুলে দেব।

শৃঙ্গভুজ রাজী হয়ে রূপশিখার কাছে সকল কথা বললে, রূপশিখা

তাঁকে কিছুটা মাটি, কিছু জল, কাঁটা আর আগুনের সঙ্গে একটা সুন্দর ঘোড়া দিয়ে বললে, এই ঘোড়ায় চড়ে আপনি সেখানে যান, সঙ্গে এইগুলি নিয়ে যান। তারপর কাকাকে নিমন্ত্রণ ক'রে ঘোড়ায় চড়ে ওকে চাবুক লাগালেই ও নক্ষত্রবেগে ছুটবে। আপনি বার বার মুখ ফিরিয়ে পেছন দিক দেখতে থাকবেন। যদি কাকাকে আসতে দেখেন তা হ'লে প্রথমে মাটিটা পেছন দিকে ছুড়বেন, যদি তাতেও তিনি আসতে থাকেন, তা হ'লে এই জল ছুড়বেন, যদি তাতেও তিনি নিবৃত্ত না হ'ন তা হ'লে ছুড়বেন কাঁটা, আর তাতেও যদি তিনি আপনার পিছু ধাওয়া করতে থাকেন তা হ'লে সর্বশেষ এই আগুন ছুড়বেন। ঘোড়া ছুটিয়ে একটুও থামবেন না আপনি কোথাও। এই রকম করলেই আপনি নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারবেন, কোনো ভয় নেই আপনার।

রূপশিখার পরামর্শ পাবার পর তার দেওয়া জিনিসগুলি নিয়ে শৃঙ্গভুজ তখনই ঘোড়ায় চড়ে সেই দেবালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। ঘোড়া ঝড়ের বেগে চলে, তাই অতি অল্প সময়ের মাঝেই শৃঙ্গভুজ বনের মাঝে সেই দেবালয়ের সামনে গিয়ে হাজির হ'লেন। মন্দিরের মাঝে যে বিশ্বেশ্বরের মূর্তি, বামে তার গৌরী, দক্ষিণে গণপতি। শৃঙ্গভুজ পরম ভক্তিভরে মূর্তি-দর্শন ও প্রণাম শেষ ক'রে তাড়াতাড়ি ধূমশিখের নিমন্ত্রণের কাজটাও সেরে নিলেন, তারপর ফিরবার জন্য ঘোড়া ছুটালেন বায়ুবেগে। তখনই রূপশিখার পরামর্শ মনে পড়ায় ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন পিছন দিকে : এই রে, ঐ ত আসছে ধূমশিখ তাঁর পিছন ধাওয়া ক'রে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গভুজ সেই মাটির ঢেলা ছুড়ে দিলে পিছন দিকে। আরে, একি! মাটির ঢেলা যে দেখতে না দেখতে বিরাট একটা পাহাড় হয়ে উঠল। কিন্তু হ'লে হবে কি, ধূমশিখ সেই পাহাড় ডিঙিয়ে এখনও যে তাঁর পিছনে ছুটছে। দেখামাত্র তিনি রূপশিখার দেওয়া জল ছুড়লেন পিছনে, সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ ঢেউ-ওয়ালা মস্ত চওড়া একটা নদী হয়ে গেল

সেখানে। ধূমশিখ অনেক কষ্টে সে নদীও সাঁতরে পার হয়ে শৃঙ্গভুজের পিছনে ছুটতে লাগল। শৃঙ্গভুজ ছুড়লেন এবার কাঁটাগুলি, ছুড়বার সঙ্গে সঙ্গে কাঁটাগাছের একটা মহারণ্য হয়ে উঠল সেখানে। ধূমশিখ সে কাঁটাবনও কোনোরকমে পার হয়ে শৃঙ্গভুজের পিছনে ছুটতে লাগল, দেখে শৃঙ্গভুজ এবার তাঁর শেষ সম্বল আগুনটুকু ছুড়লেন পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে সে আগুন একেবার প্রলয়াগ্নি হয়ে উঠল, শিখা তার একেবারে আকাশ ছুঁয়ে নিলে, ধূমশিখ সে আগুন আর পার হ'তে পারল না, বাধ্য হয়ে ফিরে গেল নিজের বাড়িতে।

শৃঙ্গভুজ নিরাপদে ধূমনগরে ফিরে এসে প্রথমেই রূপশিখার সঙ্গে দেখা ক'রে তাকে অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন, তারপর অগ্নিশিখের কাছে গিয়ে বললেন, আর্য, আপনার আদেশ পালন করেছি: আপনার ছোট ভাইকে নিমন্ত্রণ ক'রে এলাম।

অগ্নিশিখ বিস্মিত হয়ে ভাবলে কি করে এ হ'ল, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'লে কেউ ত জ্যান্ত ফিরে আসতে পারে না! প্রকাশ্যে বললে, তুমি যে সেখানে গিয়েছ তার প্রমাণ ?

শৃঙ্গভুজ মৃদু হেসে বললেন, প্রমাণ ?—প্রমাণ হচ্ছে সেখানকার দেবমন্দিরে দেখলাম শিবের বামে রয়েছেন পার্বতী, আর ডাইনে সিদ্ধিদাতা গণেশ।

শুনে অবাক্ হয়ে গেল অগ্নিশিখ: এ তা হ'লে কখনই সামান্য মানুষ নয়, ছদ্মবেশে নিশ্চয় কোন দেবতা। যাই হ'ক, এই তা হ'লে আমার মেয়ে রূপশিখার যোগ্য বর। শৃঙ্গভুজকে তখন সে বললে, আচ্ছা বাপু, ঠিক আছে, তুমি এখন আমার মেয়ের সঙ্গে বসে গল্পসল্প করো, কাল তোমাদের বিয়ে দেব।

পরদিন অগ্নি সাক্ষী ক'রে অগ্নিশিখ শৃঙ্গভুজের হাতে মেয়ে রূপশিখাকে সম্প্রদান করলে। তখন দেখে কে বলবে, এরা সামান্য মানুষ আর রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করেছে।

শৃঙ্গভুজ বিয়ের পর কয়েক দিন রূপশিখার সঙ্গে শ্বশুর বাড়িতে বেশ মনের আনন্দে কাটালেন, তারপর বাড়ির জন্য তাঁর মন উতলা হয়ে উঠায় স্ত্রী রূপশিখাকে বললেন, দেখ, অনেক দিন ত হয়ে গেল, এবার তোমাকে আমি নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চাই।

রূপশিখা বড় ভাল মেয়ে, বললে, জন্মভূমি এবং আত্মীয়-স্বজন অবশ্য সবারই প্রিয়, কিন্তু স্ত্রীলোকদের স্বামীর চেয়ে প্রিয় এবং বড় আর কিছু নেই, সুতরাং তুমি যেখানে আমায় নিয়ে যাবে, সেখানেই আমি যাব, সেই আমার স্বর্গ। কিন্তু খবরদার, বাবাকে যেন বলতে যেও না এ কথা। একবার তার কানে গেলে তুমি আর আমায় নিয়ে যেতে পারবে না, পালিয়ে যেতে হবে আমাদের। অবশ্য আমাদের পালানোর কথা শুনলেই তিনি আমাদের পিছু ধাওয়া করবেন, তা করুন, আমি নিজ বিদ্যাবলে তাঁকে রুখব।

যাওয়ার বন্দোবস্ত সব ঠিক হয়ে গেলে রূপশিখা সেই সোনার তীরটা এনে স্বামীকে দিলে, তারপর শরবেগ নামে দ্রুতগামী একটা ঘোড়া এনে দুইজন উদ্যান ভ্রমণে যাচ্ছে ব'লে তাতে চড়ে রওয়ানা দিলে বর্ধমানের দিকে।

বেশ কিছুদূরে চলে এসেছে তারা এমন সময় আকাশে সোঁ-সোঁ শব্দ হ'লে রূপশিখা সেদিকে চেয়ে ব'লে উঠল, এই রে, বাবা ত টের পেয়ে গেছেন, ঐ দেখ ছুটে আসছেন আকাশ-পথে।

শুনে শৃঙ্গভুজ বেশ একটু ভয় পেয়ে গেলেন।

রূপশিখা তা দেখে বললে,—কি, ভয় করছে? কিছুই ভয় নেই, ছাখ না আমি কি করি।...তুমি ঘোড়ার পিঠেই বসে থাক, আমি তিরস্করিণী বিদ্যা দিয়ে তোমাকে এমনি করে ঢেকে রাখছি যে বাবা তোমাকে দেখতেই পাবেন না।

রূপশিখা এই কথা বলে তখনই ঘোড়া থেকে নেমে পুরুষ বেশ ধারণ করলে। পাশেই একটা কাঠুরে কাঠ কাটছিল, তাকে

রাক্ষসের ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে কুড়ুলটা নিয়ে নিজে কাঠ কাটতে শুরু করে দিলে।

অগ্নিশিখ তখনই সেখানে এসে গিয়ে—পুরুষবেশী রূপশিখাকে চিনতে না পেরে তাকেই জিজ্ঞাসা করলে, ও হে, এ পথ দিয়ে কোনো পুরুষ বা স্ত্রীলোককে যেতে দেখেছ, বেশ ভালো চেহারার ?

—না মশায়, না, কাউকে যেতে দেখি নি এ পথে! রাক্ষসরাজ অগ্নিশিখ মারা গেছেন, তাঁর দাহের জন্যে কাঠ কাটছি আমি, আমায় বিরক্ত করবেন না।

অগ্নিশিখ একথা শোনামাত্র একেবারে 'হাঁ' হয়ে গেল : অ্যাঁ, এ বলে কি, আমি তবে মারা গেছি। যদি মারাই গিয়ে থাকি তা হ'লে আর কনে-জামাইয়ের খোঁজে আমার দরকার কি ? দেখি একবার বাড়ি যাই, গিয়ে বাড়ির লোকদের কাছে শুনি আমি মারা গেছি কি না!

এই ভেবে অগ্নিশিখ যেই বাড়ির দিকে ফিরল—অমনি রূপশিখা হেসে নিজের মূর্তি ধরে স্বামীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বর্ধমানের দিকে রওয়ানা হ'ল।

রাক্ষসরাজ বাড়ি ফিরে গিয়ে তার বাড়ির লোকজনদের জিজ্ঞাসা করলে, হ্যা গা, আমি না কি মারা গেছি, যদি মারাই গিয়ে থাকি তা হ'লে আর মেয়ের খোঁজ করে কি হবে!

বাড়ির লোকেরা তার কথা শুনে মনে মনে হেসে তাকে বুঝিয়ে দিলে যে সে মরে নি, তখন সে আবার মেয়ের খোঁজে বেরুল। রূপশিখা দূর থেকে আবার তার বাবাকে আসতে দেখে স্বামীকে ঠিক আগের মত করে আচ্ছাদন করে রাখলে, আর নিজে এবার এক পত্রবাহকের মূর্তি ধারণ করলে। অগ্নিশিখ যখন তার কাছে এসে আগেকার মত জিজ্ঞাসা করলে, তখন সে উত্তর দিলে, না মশায়, আমি ত কাউকে এ পথ দিয়ে যেতে দেখি নি, রাক্ষসরাজ অগ্নিশিখ শত্রুহস্তে নিদারুণ আহত হয়ে মরমর, তিনি তাঁর ছোট

ভাই ধূমশিখকে রাজ্য দেবেন বলে এই পত্র লিখে আমার হাতে দিয়েছেন, আমি তাই নিয়ে তাঁর ছোট ভাইয়ের কাছে যাচ্ছি।

মূর্খ অগ্নিশিখ ছদ্মবেশী রূপশিখার মুখে এই কথা শুনে সন্দিগ্ধমনে আবার বাড়িতে ফিরে গেল। তারপর সবাইকে একত্র করে যা শুনে এসেছে পথে, সেই সব বলে জিজ্ঞাসা করলে, এ সত্যি না কি ?

পরিজনেরা তার কথা শুনে হাসতে লাগল। তারপর বুঝিয়ে দিল যে, ও কথা সত্যি নয়, ভাবনার কারণ নেই কোনো। তখন অগ্নিশিখ বিরক্ত হয়ে ভাবলে, দূর ছাই, আর মেয়েকে খুঁজে কাজ নেই।

এদিকে রূপশিখা দ্বিতীয়বার বাপকে ঠকিয়ে স্বামীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আবার বর্ধমানের দিকে রওয়ানা হ'ল।

দুইজন বর্ধমান এসে পৌঁছলে, লোকমুখে যেই রাজা বীরবাহুর কাছে খবর গেল, পুত্র শৃঙ্গভুজ সস্ত্রীক নগর প্রান্তে এসে গেছেন তখন তিনি নিজেই ছুটে গিয়ে পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করে তাঁকে এবং পুত্রবধূকে পরম সমাদরে রাজধানীতে নিয়ে এলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর শৃঙ্গভুজ আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বাপের কাছে ব'লে তাঁর ভাইদের ডেকে সেই সোনার তীরটা তাদের দিয়ে দিলেন। রাজা বীরবাহু অতিশয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি। শৃঙ্গভুজের মুখে সব কথা শুনেই তিনি বুঝতে পারলেন সব ব্যাপার। শৃঙ্গভুজের উপর তিনি যেমন খুশি হলেন, বিরক্ত হলেন তেমনি আর সব ছেলেদের উপর। সঙ্গে সঙ্গে মনে হতে লাগল নিরপরাধী গুণবরাকে অকারণে পরিত্যাগ করে কি মহাপাপই না তিনি করেছেন !

রাজা সারাদিন বিষয়-কর্ম করে সে রাত্রে ইচ্ছা করেই যশোলেখার ঘরে বাস করতে গেলেন। অনেক দিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে রাজাকে নিজের ঘরে পেয়ে যশোলেখা মনের আনন্দে অনেক করে

মাদকদ্রব্য পান করলেন। নানা কথাবার্তার পর যথাসময়ে দুইজনেই ঘুমের জন্যে চোখ বুঝলেন। কিন্তু বেশী মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে আর মনের আনন্দে যশোলেখার ভাল ঘুম হ'ল না, তিনি অর্ধচেতন অবস্থায় পাগলের মত প্রলাপ বকতে লাগলেন: হা, হা, হা, কি মজা! ভাগ্যিস্ গুণবরার নামে মিথ্যা কুৎসা রটিয়ে আমি তাকে নির্বাসিত করতে পেরেছি, নইলে, রাজা কি গুণবরাকে ছেড়ে আমার ঘরে আসেন, হা, হা, হা—

যশোলেখার প্রমত্ত উৎকট প্রলাপে রাজার তন্দ্রা কেটে গেল। তিনি যশোলেখার উক্তির মর্মার্থ পুরোপুরি উপলব্ধি করতে পেরেছেন, আর সংশয় নেই যে গুণবরা নিরপরাধ। নিতান্ত নিরপরাধীকে তিনি পাতাল-ঘরে নির্বাসন দিয়েছেন। অনুতাপে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে যশোলেখার দুষ্কৃতির কথা স্মরণ করে ক্রোধে সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। রাজা তখনই যশোলেখার কক্ষ ত্যাগ ক'রে নিজের ঘরে এসে বাকী রাত্রিটুকু বিনিদ্র কাটিয়ে দিলেন। ভোর হলেই তিনি ডেকে পাঠালেন প্রধান অন্তঃপুর-রক্ষিকাকে। সে সামনে এসে নমস্কার করে দাঁড়াতেই তিনি নিপুণ অভিনেতার মত শান্তকণ্ঠে বললেন, সিদ্ধপুরুষের আদেশে যে অনিষ্টাশঙ্কা করে আমি রাণী গুণবরাকে মাটির নিচের ঘরে থাকবার নির্দেশ দিয়েছিলাম, সে অনিষ্টের কাল উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এখন আর তাঁর সেখানে থাকবার প্রয়োজন নেই, তুমি এখনই তাঁকে সেখান থেকে আমার কাছে নিয়ে এস।

প্রধান অন্তঃপুর-রক্ষিকা রাজাদেশে তখনই পাতাল ঘরে গিয়ে রাজার নির্দেশ জানিয়ে গুণবরাকে নিয়ে এল, তারপর স্নান করিয়ে ভাল জামা কাপড় অলংকার পরিয়ে রাজার কাছে নিয়ে এল। রাজা বহুদিন পর গুণবরাকে কাছে পেয়ে পরম হৃষ্টচিত্তে তাঁকে পাশে বসিয়ে পুত্র শৃঙ্গভুজের সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁকে খুলে বললেন। গুণবরার

পুত্রের সঙ্গে পুত্রবধূকে দেখবার অভিলাষ হওয়ায় রাজা তখনই একজন পরিচারিকার সাহায্যে তাদের ডেকে পাঠালেন।

এদিকে যশোলেখা ঘুম থেকে যখন দেখলেন স্বামী পাশে নেই, তখন তাঁর দুঃখ এবং উদ্বেগের সীমা রইল না।

আর রাজার আহ্বানে শৃঙ্গভুজ তখনই তাঁর স্ত্রী রূপশিখাকে সঙ্গে নিয়ে এসে মায়ের চরণে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। গুণবরা আনন্দে বিগলিত হয়ে ছেলে বউকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আনন্দে চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

রাণী একটু স্থির হলে রাজা শৃঙ্গভুজকে বললেন, রূপশিখা তোমার জন্যে যা যা করেছে তা নিজের মুখে তোমার মাকে একটু শোনাও না, বাবা!

বাপের কথায় শৃঙ্গভুজ যখন রূপশিখার সমস্ত কাহিনী মায়ের কাছে বলা শেষ করলে, গুণবরা তখন আনন্দে অধীর হয়ে পুত্রবধূকে কোলে টেনে নিয়ে তার গায়ে-মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বলতে লাগলেন, লক্ষ্মী মা আমার! সতী-শিরোমণি। এমন সতীলক্ষ্মী কই—আমরা ত কখনও দেখি নি,—শুনি নি,—তারপর রাজার দিকে চেয়ে বললেন, রাক্ষস-কন্যা এ নয়, বিধাতা ছল করে কোনো দেবকন্যাকে আমাদের ঘরে পাঠিয়েছেন। এমনি ক'রে রাজা ও রাণী অনেকক্ষণ ধরে পুত্রবধূর গুণ আলোচনা করতে লাগলেন।

এরপর?

এরপর রাজার ত আরও কর্তব্য তখনও বাকী। অন্তঃপুর-রক্ষক সুরক্ষিত তীর্থপর্যটন করে ফিরে এসেছে, তাকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তাকে সমাদর জানিয়ে অনেক মিষ্টি কথা বলে আবার কার্যভার গ্রহণ করতে আদেশ দিলেন।

আর?

আর তাকেই আদেশ দিলেন, যশোলেখা এবং আর আর রাণীদের ভূ-গৃহে নির্বাসিত করতে।

রাজার এই বিষম আদেশ শুনে রাণীরা সব রীতিমত ভয় পেয়ে গেলেন, কারো কারো চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। দয়াবতী গুণবরা তাঁদের এই দুর্দশা দেখে কাতর কণ্ঠে বারবার স্বামীকে এই দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করতে অনুরোধ ক'রতে লাগলেন। রাজা গুণবরার এই ক্ষমাগুণ ও করুণা দেখে মনে মনে আরও খুশি হয়ে তাঁর দণ্ডাদেশ ফিরিয়ে নিলেন। রাণীরা গুণবরার ঔদার্য দেখে লজ্জায় অধোমুখ হয়ে রইলেন।

আর ?

আরও আছে বই কি !—নির্বাসিতভুজ প্রভৃতি রাজার যে আর নিরানব্বইটি ছেলে শৃঙ্গভুজের জীবন নাশের ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের উপর আদেশ হ'ল তারা সবাই নিজেদের পাপমুক্তির জন্য এক বছর ধরে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়াবে। রাজধানীতে তারা আর থাকতে পাবে না।

নিরানব্বইটা ছেলে রাজার আদেশে নগর ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গে শৃঙ্গভুজ বাপের পা ধরে কেঁদে পড়লেন ঃ বাবা, আমার বড় কষ্ট হচ্ছে, আমার মুখ চেয়ে আপনি আমার ভাইদের ক্ষমা করুন। শৃঙ্গভুজের কাতর প্রার্থনা শুনে রাজা অপরাধী পুত্রদের ক্ষমা করলেন, তাদের ফিরিয়ে আনবার আদেশ দিলেন। তারা ফিরে এসে যখন সকল কথা শুনল—তখন ছোটভাই শৃঙ্গভুজের উদার মনোভাব আর ক্ষমা-করুণার কথা ভেবে একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে গেল। তখন থেকে তারা ছোটকে একেবারে প্রাণের অধিক ভালবাসতে লাগল।

কিছুদিন পরেই যখন যৌবরাজ্যে অভিষেকের ব্যাপার এসে গেল, তখন রাজা বীরবাহু আর জ্যেষ্ঠাজ্যেষ্ঠ বিচার না করে গুণ আর দক্ষতার দিক দিয়ে বিচার করে কনিষ্ঠ পুত্র শৃঙ্গভুজকেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করলেন।

যুবরাজ হবার পরই শৃঙ্গভুজ সৈন্যসামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে

অনেক দেশ জয় ক'রে বহু ধনসম্পদ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন। ভাইয়েরা এখন আর তাঁকে হিংসা করে না, বরং ভালবাসে, ছোট হলেও শ্রদ্ধা করে। বিমাতারাও তাঁকে নিজের ছেলের মতই ভালবাসেন। সুতরাং শৃঙ্গভুজ এখন বাপ, মা, বিমাতা, নিরানব্বই ভাই এবং সতীলক্ষ্মী ভার্যাকে নিয়ে সুখে দিনপাত করতে লাগলেন।

দেশে শক্তি উদার্য, ক্ষমা, সতীত্ব আর করুণার মাহাত্ম্য প্রচারিত হ'ল।

পুষ্পদণ্ডের উপাখ্যান

গঙ্গার তীরে সুন্দর একটি গ্রাম। গ্রামের নামটিও বেশ—বহু সুবর্ণক। সেই গ্রামে বহুশাস্ত্রজ্ঞ নিষ্ঠাবান এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। নাম ছিল তাঁর গোবিন্দদত্ত। তাঁর স্ত্রীর নাম অগ্নিদত্তা। অগ্নিদত্তা সতী-সাধ্বী পতিব্রতা। এঁরা এত ভাললোক, অথচ এঁদের যে পাঁচটি ছেলে ছিল তারা একেবারে অকালকুষ্মাণ্ড। পাঁচ ছেলেরই চেহারা অতি সুন্দর, যেন দেবপুত্র, কিন্তু এদিকে একেবারে ক-অক্ষর গোমাংস। একদিনের কথা বললেই এদের চরিত্র বুঝা যাবে।

গোবিন্দদত্ত বাড়িতে নেই। এমন সময় একদিন বৈশ্বানর নামে এক ব্রাহ্মণ অতিথি এলেন বাড়িতে। গোবিন্দদত্তের পাঁচটি ছেলে তখন এক জায়গায় বসে খোস গল্প করছিল। অতিথি ব্রাহ্মণ সন্তানদের দেখে তাদের প্রত্যেককে নমস্কার করলেন;—ওরা পাঁচভাই তাঁকে প্রত্যভিবাদন ত করলেই না বরং তাঁকে এমন নমস্কার করতে দেখে দাঁত বের করে হি হি করে হেসে উঠল।

বৈশ্বানর এমনিতেই রাগী মানুষ, তাতে গোবিন্দদত্তের পাঁচ ছেলের এই অসভ্য মূর্খের মত অবিনীত ব্যবহার দেখে তিনি ভীষণ চটে গিয়ে তখনই স্থান ত্যাগ ক'রে হন্ হন্ করে ছুটে চললেন। একটু যেতেই পথে গোবিন্দদত্তের সঙ্গে দেখা—

: এ কি! এত বেলায় হন্ হন্ ক'রে চলেছেন কোথায়—আসুন, আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন, আতিথ্য গ্রহণ করে ধন্য করুন আমায়।

বৈশ্বানরের তখন চোখ জ্বলছে রাগে। তিনি গোবিন্দদত্তের ছেলেদের ব্যবহারের কথা আনুপূর্বিক বিবৃত করে বললেন,—তোমার ছেলেরা সব অতি অতি মূর্খ। তাদের সংসর্গে তুমিও মূর্খ হয়ে গেছ, আর শাস্ত্রে বলে মূর্খেরা পতিত, আমি পতিত ব্রাহ্মণের অন্ন ত ভাল—তার ছোঁয়া জল স্পর্শ করি না।—এই বলে বৈশ্বানর চলেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু গোবিন্দদত্ত তাঁকে বহু অনুনয়-বিনয় ক'রে বললেন, আপনি বিমুখ হয়ে চলে গেলে যে আমার মহাপাপ হবে, নরকে পচতে হবে আমায়। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, ওদের সংসর্গে আর আমি থাকব না।

এদিকে গোবিন্দদত্তের ব্রাহ্মণী অগ্নিদত্তাও অতিথি ফিরে যেতে দেখে অতীব ক্ষুণ্ণ এবং ভীত হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে পিছু পিছু আসছিলেন। স্বামীকে অতিথির সঙ্গে কথা বলতে দেখে তিনিও সেখানে এসে অতিথিকে নানা অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। দুইজনের মধুর বিনয়ে অতিথির মন শেষে নরম হয়ে এল, গোবিন্দদত্তের বাড়িতে আতিথ্য নিতে শেষে তিনি রাজী হলেন।

ব্যাপার দেখে শুনে ছেলেদের এবার টনক নড়ল: তারা যে কত বড় অন্যায় কাজ করেছে তা বুঝতে পেরে তারা সবাই অনুতপ্ত হ'ল। সবচেয়ে বেশি দুঃখ লাগল যে ছেলেটির—তার নাম দেবদত্ত। দেবদত্ত মনের ধিক্কারে সংসার ছেড়ে বৈরাগী হয়ে বদরিকাশ্রমে চলে গেল। সেখানে তপস্যা করবে সে; ভগবান চন্দ্রমৌলির আরাধনা করবে। বদরিকায় এসে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে সে শিবের উপাসনায় রত হ'ল। তার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে শঙ্কর একদিন তার কাছে আত্মপ্রকাশ ক'রে বললেন, তোমার তপস্যায় তুষ্ট হয়েছি আমি, কি বর চাও তুমি, বলো?

দেবদত্ত বললে, ভগবান, আর কিছু চাই না আমি, আপনার অনুচর হতে চাই।

শিব বললেন, বেশ তাই হবে, কিন্তু তার আগে তুমি নানা বিদ্যা অর্জন করে এই মর্ত্যভূমে থেকে কিছু ভোগসুখ কর। তারপর তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

শিবের আদেশ পালন করতে দেবদত্ত প্রথমে এল পাটলীপুত্র, এসে শিষ্য হ'ল বেদকুম্ভ নামে এক গুরুর। কিন্তু বেশীদিন এখানে বিদ্যালাভ করা চলল না। গুরু বেদকুম্ভের স্ত্রীর দৌরাত্ম্যে গুরুর ঘর ছাড়তে হ'ল তাকে। এরপর এল সে প্রতিষ্ঠান নগরে। এখানে এসে যে গুরু মিলল তার—তাঁর নাম মন্ত্রস্বামী। বেশ বয়স হয়েছে তাঁর, অনেক বিদ্যা অনেক শাস্ত্রে পণ্ডিত। এই গুরুর কাছে থেকে অনেক শাস্ত্র পড়ে অনেক বিদ্যা লাভ করলে দেবদত্ত।

এই সময় একদিন সে ওখানকার রাজা সুশর্মার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে এমন সময় হঠাৎ নজর পড়ল তার রাজবাড়ির একটা ঘরের জানালার দিকে। নজর পড়তেই সে একেবারে অবাক্ হয়ে গেল: একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। মেয়েটি আর কেউ নয়, রাজা সুশর্মারই পরম রূপবতী এবং গুণবতী মেয়ে শ্রী। শ্রীর দেবদত্তের দিকে চেয়ে থাকবারও কারণ ছিল, দেবদত্তের চেহারাটা সত্যিই বড় সুন্দর।

শ্রী যেই দেখলে দেবদত্ত তার দিকে চেয়েছে অমনি ইশারায় ডাকলে তাকে কাছে। দেবদত্ত ইঙ্গিত পেয়ে এগিয়ে গিয়ে জানালার নিচে গিয়ে দাঁড়াল। রাজকন্যা শ্রী তখন অদ্ভুত একটা কাজ করলে: একটা ফুলের তোড়া দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ছুড়ে দিলে তার দিকে। দেবদত্ত অন্যের অলক্ষ্যে তোড়াটা তুলে নিলে হাতে। রাজকন্যা দেখে মুচকি হেসে জানালাটা বন্ধ করে দিলে।

রাজবাড়ির জানালার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকা কোনো দিক দিয়েই উচিত হবে না ভেবে দেবদত্ত তোড়াটা হাতে করেই সেখান থেকে সরে এল। পথে যেতে যেতে সে কেবলি ভাবতে লাগল: এ কি হ'ল—এর মানে কি, রাজকন্যা আমায় ইসারায় ডাকলে,

মুখে কোনো কথা না বলে দাঁত দিয়ে শুধু একটা ফুলের তোড়া আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে জানালা বন্ধ করলে। রাজকন্যার অভিপ্রায় কি, ইঙ্গিতে কি করতে বললে সে আমায়, কিছুই যে বুঝছি না আমি ;—এখন আমি কি করি ?

ভাবতে ভাবতেই ঘরে ফিরে এল দেবদত্ত। সেখানে এসেও ঐ ভাবনা। ভাবনায় এমন কাতর হয়ে পড়েছে দেবদত্ত যে, কারো সঙ্গে কথা বলতে পারছে না, আহার-নিদ্রার নাম নেই। তার এই অবস্থা দেখে বৃদ্ধ অধ্যাপক ভাবনায় পড়লেন : কি হ'ল তাঁর প্রিয় শিষ্য দেবদত্তের, কোন অসুখ করলে কি ? কি, কোনো মনঃকষ্ট। কারো কাছে জিজ্ঞাসা করেও কোন সদুত্তর পেলেন না মন্ত্রস্বামী।

মন্ত্রস্বামী শুধু বয়সেই প্রবীণ নন —অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান। অনেক ভেবে-চিন্তে তিনি শিষ্য দেবদত্তের কাছে তার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। দেবদত্ত সব কথাই খুলে বললে গুরুর কাছে। বিচক্ষণ বুদ্ধিমান লোকেরা অল্প একটু শুনলেই অনেক কিছু বুঝে নিতে পারেন। মন্ত্রস্বামী শিষ্যের মুখে রাজকন্যার ফুল ছোড়ার কথা শুনেই বললেন, তুমি অত ভেবো না বাপু,—এ অতি সহজ কথা। এই নগরের পাশেই পুষ্পদণ্ড নামে একটা মন্দির আছে, চারিদিকে তার ফুলের গাছে ঢাকা, অতি নির্জন নিরালা জায়গা। রাজকন্যা দাঁত দিয়ে ফুলের তোড়া ছুড়ে তোমায় সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছে।

দাঁত দিয়ে ফুল ছোড়ার রহস্য উদ্ঘাটিত হওয়ায় দেবদত্ত যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। সে তখনই পুষ্পদণ্ড মন্দিরের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগেই সে সেখানে পৌঁছে ফুল গাছের ঝোপের মাঝে লুকিয়ে রইল। সন্ধ্যার পরে যখন চারিদিক আঁধার হয়ে এল তখন পূজা করবার ছলে শ্রী একাই সেখানে এসে হাজির হ'ল। দেবদত্ত তাকে আসতে দেখেই ঝোপের মাঝ থেকে বেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

দেখে রাজকন্যা বড় খুশি: এই যে তুমি এসেছ। আমার সঙ্কেত বুঝতে পেরেছিলে তা হ'লে ?

দেবদত্ত বড় সরল আর সত্যবাদী। বললে, না, আমি নিজে বুঝতে পারি নি। ভেবে ভেবে যখন আমি আর কোন কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না, তখন আমার অবস্থা দেখে আর সকল কথা শুনে আমার বিচক্ষণ গুরুই আমায় বুঝিয়ে দিয়েছেন।

দেবদত্তের মুখে এই কথা শুনবামাত্র রাজকন্যা শ্রী বিরক্তি আর ক্রোধে আত্মহারা হয়ে বললে, তোমার মত মূর্খ আর অপদার্থ পুরুষের মুখদর্শন করতে চাই না আমি, তুমি এখনই আমার সামনে থেকে দূর হও।—এই কথা বলবার সময় রাজকন্যার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগল। রাগে কাঁপতে কাঁপতে সে তখনই সেখান থেকে চলে গেল। দেবদত্ত হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল।

এরপর তার পূর্ণসংজ্ঞা ফিরে এলে সে ভাবতে লাগল: সত্যি আমি মহামূর্খ; এ কথা আমি রাজকন্যাকে বলতে গেলাম কেন? নিজের দোষেই পেয়ে ধন হারালাম আমি। এখন আমি কি করি? বেশ বুঝতে পারছি আমি, রাজকন্যাকে না পেলে প্রাণধারণই আমার অসম্ভব।

ভাবতে ভাবতে দেবদত্ত একেবারে উন্মাদের মত হয়ে উঠল। দেবদত্ত যদি একেবারে সাধারণ মানুষের মত হ'ত, তা হলে হয়ত সে পুরোপুরি উন্মাদই হয়ে যেত,—অথবা দুঃখ সহ্য করতে না পেরে মৃত্যুর কোলে গিয়ে সান্ত্বনা লাভ করত। কিন্তু দেবদত্ত ত একেবারে সাধারণ নয়, একদিন সে বকরিকাশ্রমে গিয়ে তপস্যা দ্বারা শিবকে তুষ্ট করেছিল। দেবতার আরাধনা কখনও বিফল হয় না, এবার ভক্তের দুঃখ দেখে শঙ্কর পঞ্চশিখ নামে তাঁর এক অনুচরকে পাঠালেন তাকে সাহায্য করতে। পঞ্চশিখ দেবদত্তের কাছে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে নিজে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করলেন, আর দেবদত্তকে একটি তরুণী স্ত্রীলোকের বেশে

সাজালেন, তারপর তাকে নিয়ে রাজা সুশর্মার কাছে এনে হাজির হলেন।

রাজা তাঁর আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বললেন, মহারাজ, আমি বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমার একটি মাত্র ছেলে ছিল, এটি তার স্ত্রী। ছেলেটি বহুদিন নিরুদ্দেশ। বহুলোককে দিয়ে বহু জায়গায় খোঁজ করলাম, তার কোন হদিস মিলল না, এবার আমি নিজেই একটু খোঁজ করে দেখতে চাই। কিন্তু আমার এ বধূমাতাকে কোথায় রেখে যাই। যুবতী মেয়েকে ত যে কোনো লোকের আশ্রয়ে রাখা চলে না। রাজা সকলের রক্ষাকর্তা,—তাই অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে আপনার এখানেই নিয়ে এসেছি একে, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত একে আপনি আশ্রয় দিলে,—আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করব।

রাজার আর এতে কি আপত্তি থাকতে পারে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রবধূকে কিছুদিনের জন্য তাঁর অন্তঃপুরে স্থান দিতে বলছেন, না দিলে রুষ্ট হয়ে অভিশাপ দিতে পারেন, আশ্রয় দিতে রাজার কোন অসুবিধাই নেই, সুতরাং রাজা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কথায় রাজী হয়ে গেলেন। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ-কন্যাকে নিরাপদ জায়গায় রাখবার জন্য নিজের মেয়ের কাছেই তার থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রকৃত ব্যাপার রাজা ত জানলেনই না, এমন কি তাঁর কন্যা শ্রীও প্রথমে জানতে পারল না।

শ্রী ব্যাপারটা প্রথম কিছুদিন বুঝতে না পারলেও খুব বেশীদিন তার কাছে অজানা রইল না, বুদ্ধিমতী বিদুষী শ্রী একদিন গূঢ় রহস্য ভেদ করে ফেললে। এবার আর সে দেবদত্তকে প্রত্যাখ্যান করলে না, বরং দেবদত্ত যে কৌশল করে, চাতুর্য করে তার কাছে আসতে পেরেছে এতে সে মনে বেশ খানিকটা খুশিই হ'ল, শ্রদ্ধাও বেড়ে গেল তার দেবদত্তের উপর।

তারপর ?

তারপর গন্ধর্ব-বিধানে দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল। রাজকন্যার ঘরে নিরাপদে সুখে-স্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে দু'জন কাল কাটাতে লাগল।

বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর রাজকন্যা সন্তানসম্ভবা হ'ল। বিপদ বুঝে দেবদত্ত শিবাচরকে স্মরণ করলেই তিনি এসে দেবদত্তের সঙ্গে দেখা করলেন। দেবদত্ত সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বললে তিনি তদ্দণ্ডেই তাকে নিয়ে সবার অলক্ষ্যে শূন্য পথে অন্তর্হিত হলেন।

পরদিন সকালে রাজা সুশর্মা সভা করে বসেছেন, এমন সময় শিবানুচর আবার সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে দেবদত্তকে নিয়ে তাঁর সামনে এসে হাজির হলেন। দেবদত্তের এবার আর স্ত্রীলোকের বেশ নয়। তরুণ পুরুষের বেশ। ব্রাহ্মণ এসেই রাজাকে বললেন, মহারাজ, আমি আমার পুত্রকে খুঁজে পেয়েছি। এই সঙ্গে যাকে দেখছেন এই আমার পুত্র, এবার আমার পুত্রবধূকে অন্তঃপুর থেকে আনিয়ে দিন।

শুনবার সঙ্গে সঙ্গে রাজা মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন। গত রাত্রেই তিনি খবর পেয়েছেন ব্রাহ্মণের পুত্রবধূটিকে অন্তঃপুরে কোথায়ও পাওয়া যাচ্ছে না, সে কোথায় পালিয়ে গেছে, আর সকালেই ব্রাহ্মণ তাকে নিতে এসে হাজির। তাঁর মনে হতে লাগল এ নিশ্চয়ই কোন দেবতার ছলনা, নইলে আমার সুরক্ষিত অন্তঃপুর থেকে একটা স্ত্রীলোক হঠাৎ এমন পালিয়ে যাবে কি করে? কিন্তু আমি এখন কি করি, ব্রাহ্মণ অসন্তুষ্ট হলে ত আমাকে অভিশাপ দেবেন। রাজা সুশর্মা অনেক ভেবে-চিন্তে শেষে ব্রাহ্মণকে বললেন, যদি অভয় দেন ত একটা কথা বলি।

বলুন।

আপনার কাছে আমার অপরাধ হয়ে গেছে, অবশ্য এটা আদৌ ইচ্ছাকৃত নয়। আপনার পুত্রবধূটিকে আমি অন্তঃপুরে

রেখে অতি সযত্নে নিজের কন্যার মতই রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন করছিলাম, কিন্তু কি বলব, অদৃষ্ট, কাল রাত্রি থেকে আর তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ রাজার কথা শুনে কৃত্রিম শোক প্রকাশ করে বললেন, তা হলে উপায়? অনেক কষ্টে আমি ছেলেকে খুঁজে বের করলাম, এখন পুত্রবধূ নেই, একে আমি কি বলে প্রবোধ দেব! ছেলে রেখে গেল বাপের কাছে, বাপ রেখে গেল রাজার কাছে, তবুও রক্ষা করা গেল না! পুত্রবধূ-শূন্য ঘর যে আমার খাঁ খাঁ করবে মহারাজ!

রাজা অনুতপ্ত হয়ে বললেন, কি করব ঠাকুর, আমি খোঁজার ত্রুটি করিনি, তবু আপনার যে ক্ষতি হয়ে গেল তাতে আমি বিশেষ দুঃখিত। এখন কি করলে আপনার দুঃখের একটা লাঘব হয়, একটু খুশি হয়ে আপনি বলুন, আমি তাই করতে রাজী আছি।

ব্রাহ্মণ একটু চুপ করে থেকে কি যেন একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, বেশ, তা হ'লে আপনার ত একটি কন্যা আছে সেই কন্যাটিই একে সম্প্রদান করুন।

ব্রহ্মশাপের ভয়ে রাজা আর এতে 'না' করতে পারলেন না। কয়েকদিনের মাঝেই বেশ ঘটা করে রাজকন্যার সঙ্গে দেবদত্তের বিয়ে হয়ে গেল। সব ঝঞ্ঝাট এবার চুকল।

ঐ এক মেয়ে ছাড়া রাজার আর কোন সন্তান ছিল না, সুতরাং দেবদত্ত রাজবাড়ির জামাই হয়ে পরম সুখে রাজৈশ্বর্য ভোগ করতে লাগল। যথাসময়ে রাজকন্যার একটি পুত্র সন্তান লাভ হ'ল। রাজা নাতি পেয়ে বড় খুশি। খুব ধুমধাম করে তার অন্নপ্রাশন দিয়ে নাম রাখলেন মহীধর।

মহীধর একটু বড় হলে দেবদত্তকে তার অভিভাবক নিযুক্ত করে রাজা তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন। আর দেবদত্ত বহুদিন

রাজ্যসুখ ভোগ করে যখন দেখলে মহীধর রাজকার্যে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে, তখন তার রাজ্য তাকে দিয়ে সহধর্মিণী স্ত্রীকে নিয়ে সেও তপস্যা করতে বনে চলে গেল। সেখানে দু'জনে বহুকাল শঙ্করের আরাধনা করবার পর মর্ত্য-দেহ ত্যাগ করে শিবলোকে গিয়ে শিবের অনুচরত্ব লাভ করলো।

দাঁত দিয়ে ফুল ছুড়ে রাজকন্যা তাকে পেয়েছিল বলে শিবের অনুচরদের মধ্যে নাম হ'ল তার পুষ্পদণ্ড, আর শ্রী হ'ল পার্বতীর সহচরী, নাম হ'ল তার জয়া।

বণিকপুত্রের উপাখ্যান

নগরের নাম চিত্রকূট। সেখানে অতি ধনবান এক বণিক ছিলেন, নাম ছিল তাঁর রত্নবর্মা। ঈশ্বরের কৃপায় যখন তাঁর এক ছেলে হ'ল তখন সে ছেলের নাম রাখলেন তিনি ঈশ্বরবর্মা। ঈশ্বরবর্মা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠতে লাগল দেখে বণিক বড় খুশি। তাঁর তখন মনে হতে লাগল—আমরা বণিক জাতি. বাণিজ্যের জন্য ছেলেকে কখন কোন দেশে কি অবস্থার মাঝে পড়তে হয়, তার ঠিক নেই, জগতে কুহকিনী নারীরও অভাব নেই, তাদের খর্পরে পড়লে কুবেরের ধন শেষ হয়ে যায়, সুতরাং কুহকিনীদের মায়া বুঝে কি করে তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষা ও ধনরক্ষা করতে হয় সে বিদ্যায়ও ছেলেকে পাকা করে তোলা দরকার। এই সব ভেবে রত্নবর্মা ছেলেকে নারীর কাপট্য বিদ্যার অন্ধি-সন্ধি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবার জন্য ঐ নগরেরই যমজিহ্বা নামে পাকা কুটনীর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন।

ঈশ্বরবর্মা দেখলে কুটনীর গাল দুটি ফুলো ফুলো, লম্বা লম্বা দাঁত, তা ছাড়া নাকটা বেশ একটু বাঁকা। হ'লে হবে কি, শিক্ষাদানে সে একবারে ওস্তাদ। ওঁরা যখন ওর বাড়িতে এলেন তখন দেখলেন কুটনী যমজিহ্বা কতকগুলি মেয়েকে শেখাচ্ছে কত রকম ছলনা করে পুরুষের কাছ থেকে অর্থ লাভ করা যায়।

যমজিহ্বা একটু থামলে রত্নবর্মা তাকে বললেন, আমি আমার এই ছেলেটিকে এনেছি তোমার কাছে। একে নারীর ছলাকলা

সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ক'রে তুলতে পারলে তোমাকে হাজার মোহর পুরস্কার দেব।

—বেশ, পাঠিয়ে দেবেন কাল থেকে।

পরদিন থেকে ঈশ্বরবর্মা যমজিহ্বার কাছ থেকে নানা কলাবিদ্যা শিক্ষা করতে লাগল। পুরো এক বছর ধরে যমজিহ্বার কাছ থেকে নানা ছলাকলা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে ঈশ্বরবর্মা বাপের কাছে এসে বললে, বাবা, যা শিখবার ছিল তা আমার শেখা হয়ে গেছে, এবার আমার হাতে নিশ্চিন্তে আপনি অর্থ দিতে পারেন আমি বাণিজ্য করতে যাব, ষোল বছর বয়স হ'ল আমার, বণিকের ছেলে আমি, আর কতদিন বসে থাকব ?

বণিক রত্নবর্মা ছেলের কথা শুনে বড় খুশি হয়ে তাকে পাঁচ কোটি মোহরের একটা তোড়া দিয়ে বললেন, খুব সাবধানে বাণিজ্য করবে, আর যমজিহ্বার কাছে যে বিদ্যা শিখেছ তা ভুলো না যেন, সুন্দরী কুহকিনী মেয়েরা দেশে দেশে ফাঁদ পেতেই আছে, তাতে পা দিও না যেন।

না, বাবা, ভুলব না।

এরপর বাপের দেওয়া মোহর আর কয়েকজন বিশ্বাসী অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঈশ্বরবর্মা বাণিজ্য-যাত্রা করল। যাবে সে সুবর্ণ দ্বীপে।

কয়েকদিন পথ চলবার পর তারা এক নগরে এসে হাজির হল, নাম তার কাঞ্চনপুর। নগরটা বড় সুন্দর। নগরের বাহিরে একটা বাগানবাড়ি ভাড়া করে ঈশ্বরবর্মা তার বন্ধুদের নিয়ে সেইখানে গিয়ে উঠল। তারপর ওখানকার দীঘিতে স্নান করে আহার-বিশ্রামাদি সেরে সন্ধ্যার কাছাকাছি সেজেগুজে নগর দেখতে বেরুল। এটা-ওটা কেনবার পর আর এক দেবালয়ে এসে হাজির হ'ল। সেখানে এসে দেখে এক দেবদাসী নাচছে। ঈশ্বর-বর্মা তাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল, মেয়েটির যেমনি মুখ,

তেমনি দেহের গড়ন, তেমনি নাচের ভঙ্গী। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে মেয়েটির নাম শুনলে সুন্দরী। হ্যাঁ সুন্দরীই বটে! ভাবলে ঈশ্বরবর্মা, সার্থক নাম রেখেছে ওর মা। নর্তকী দেবদাসীকে দেখে ঈশ্বরবর্মা এমন অভিভূত হয়ে পড়লে যে, মেয়েদের মোহপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবার জন্য যে সব বিদ্যা অর্জন করেছিল সে কুটনীর কাছ থেকে সে সবের কিছুই তার মনে পড়ল না। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নিজের এক বিশ্বস্ত বয়স্যকে পাঠালে সে সুন্দরীর কাছে নিজের অনুরাগ জানাতে।

বয়স্যের মুখে ঈশ্বরবর্মার পরিচয় এবং অনুরাগের কথা শুনে দেবদাসী পরম উৎফুল্ল হয়ে বললে, ধন্য হলাম আপনার বন্ধুর অনুরাগের কথা শুনে। আমার কুটীরে কখন তার পায়ের ধূলি পড়বে? আমি তার আসার পথ চেয়ে বসে থাকব।

নিজের বাসায় নিজের ধনরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে ঈশ্বরবর্মা সেজেগুজে যথাসময়ে দেবদাসীর বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'ল। সুন্দরীর মা তাকে যথেষ্ট আপ্যায়ন করে ঘরে বসালে। তারপর সুন্দরীকে কাছে বসিয়ে সে সেখান থেকে সরে গেল। সুন্দরী ঈশ্বরবর্মার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে তাকে অনেক মিষ্টি কথা বলতে লাগল। অনেক ভাল ভাল নাচ দেখাল, গান শুনাল। তারপর ভাল ভাল খাবার খেতে দিয়ে অতি সুন্দর এক পালঙ্কে উত্তম শয্যায় শুতে দিয়ে নিজের হাতে পাখার বাতাস করতে লাগল। ঈশ্বরবর্মার মনে হতে লাগল সে যেন স্বর্গসুখ ভোগ করছে। রাত্রিটা শুধু আনন্দে নয়, পরম আনন্দেই কাটল।

এরপর থেকে সুন্দরীর আকর্ষণ যেন ঈশ্বরবর্মার নিদারুণ নেশার মত পেয়ে বসল। রোজ রাত্রে ত তার বাড়ি আসাই চাই, তা ছাড়া যতক্ষণ বাসায় থাকে ততক্ষণও ঐ দেবদাসী সুন্দরীরই চিন্তা: কেমন করে চেয়েছে, কি মিষ্টি কথা বলেছে, কি ভাল খাবার খাইয়েছে, বিদায় নেবার সময় কেমন করে কেঁদেছে আরও কত কি—

ঈশ্বরবর্মা প্রতিদিন দেবদাসীকে পিতৃদত্ত ধন থেকে পাঁচলক্ষ ক'রে স্বর্ণমুদ্রা দেয়। প্রথম দিন যখন সে তা' দিতে গেছলো তখন দেবদাসী তা' নিতে চায়নি। বলেছিল, না, ও সবের দরকার কি, আপনার মতো রত্ন যখন দেবতা আমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন, তখন ও সবের আর আমার কোন প্রয়োজন নেই। সুন্দরীর মা মকরকটী কাছেই ছিল। সে বললে, পুত্রি, আমাদের যা-কিছু আছে সে-ও ত ওঁরই, সুতরাং ওটা নিয়ে সেখানেই রেখে দাও না কেন ?

সুন্দরী যেন মায়ের কথা শুনে নিতান্ত অনিচ্ছা এবং কষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরবর্মার দেওয়া স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে ঘরে রাখল। সেই থেকে ঈশ্বরবর্মা প্রতিদিনই দেবদাসী সুন্দরীকে পাঁচলক্ষ ক'রে সুবর্ণমুদ্রা দিয়ে যাচ্ছে।

এমনি ক'রে প্রায় দুইমাস কেটে গেল। বাণিজ্য করবার জন্য ঈশ্বরবর্মার বাপের দেওয়া পাঁচ কোটি স্বর্ণমুদ্রার প্রায় অর্ধেক সাবাড় হয়ে গেল। এই দেখে ঈশ্বরবর্মার এক বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু অর্থদত্ত তাকে একান্তে ডেকে বললে, ভাই, তুমি এ কি করছ ? কুটনীর কাছে কি শিখলে তবে, কুহকিনীর খপ্পরে পড়ে বাপের দেওয়া সব অর্থই যে শেষ করে ফেললে, এখন বাণিজ্য করবে কি দিয়ে, শুধু হাতে বাড়ি ফিরে গেলে কিন্তু বাপ তোমাকে আস্ত রাখবেন না তা' ব'লে দিচ্ছি। আমি তোমার ভালর জন্যে বলছি, এ কুহকিনীকে ছেড়ে এবার বাণিজ্যে চলো, আর কতদিন কাটাবে এমনি ক'রে, কতদিন সুন্দরীর কুহকে ভুলে থাকবে ?

অর্থদত্তের কথা শুনে ঈশ্বরবর্মা চুপ ক'রে একটুক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বললে, ভাই, তুমি যা বলছ, তা' সবই ঠিক, কিন্তু সুন্দরীর সম্বন্ধে তোমার যা ধারণা তা' ঠিক নয়, ও তেমন মেয়ে নয়, ও একটুক্ষণ আমায় না দেখে থাকতে পারে না। অতদিন আমায় না দেখলে কি বাঁচবে ? ওকে ছেড়ে বাণিজ্য করতে যাওয়ার

কথা আমি ওকে বলতে পারবো না, তুমিই ওকে একটু বুঝিয়ে বলো, তাহলে যদি আমায় যেতে দেয়।

বন্ধুর কথামতো অর্থদত্ত সুন্দরীর কাছে গিয়ে তার মা মকরকটীর সামনে তাকে বললে, বোন, একটা কথা বলতে চাই তোমায়। তুমি আমার বন্ধু ঈশ্বরবর্মাকে যেমন গভীরভাবে ভালবাস তাতে আমি এবং ওর আর আর বন্ধুরা সবাই খুশি। কিন্তু ও বাপের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে সুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছে, সেখানে ত ওর একবার যাওয়া দরকার। সেখানে গিয়ে বাণিজ্য করতে পারলে ও এত অর্থ উপার্জন ক'রে আসতে পারবে যে, যতদিন ইচ্ছা ততদিন ও এখানে পরম সুখে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু তুমি অনুমতি না দিলে ত বোন, ও সেখানে যেতে চাইছে না।

অর্থদত্তের এই কথা শুনে সুন্দরী ঈশ্বরবর্মার মুখের দিকে চেয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে অর্থদত্তকে বললে, তোমরা সকলই জানো, সকলই বোঝ, তোমার বন্ধু যেতে চান—যান, আমার যা ভাগ্যে থাকে তাই হবে। নিজের অন্তর ত আর কেউ কাউকে দেখাতে পারে না যে, তোমরা দেখবে।

মকরকটী তার মেয়েকে প্রবোধ দিয়ে বললে, পুত্রি, তুমি দুঃখ করো না, একটু ধৈর্য ধরে থাকো, বর্মার পো বাণিজ্য ক'রে অর্থশালী হয়ে নিশ্চয়ই আবার এখানে ফিরে আসবে। ততদিন একটু চেষ্টা ক'রে মন ঠাণ্ডা রাখো।

এরপর মকরকটী অপরের অলক্ষ্যে গোপনে সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে একটা কুয়োর কাছে গিয়ে তাতে একটা জাল পেতে, সেটা বেশ আচ্ছা ক'রে বেঁধে রেখে এল।

এদিকে সুন্দরীকে ছেড়ে যেতে হবে ব'লে ঈশ্বরবর্মার মন হয়ে উঠল রীতিমত চঞ্চল, সুন্দরী ত খাওয়া-দাওয়া একরকম ছেড়ে দিল বললেই হয়, নাচগান একেবারে বন্ধ। ঈশ্বরবর্মা নানা মিষ্টি কথায় তাকে প্রবোধ দিতে লাগল।

যাওয়ার দিন খাওয়া-দাওয়া সেরে ঈশ্বরবর্মা সুন্দরীর বাড়ি থেকে বেরুলে সুন্দরী কাঁদতে কাঁদতে তার পিছু পিছু সেই কুয়ো পর্যন্ত তার মায়ের সঙ্গে এলে ঈশ্বরবর্মা সেখান থেকে বিদায় নিয়ে যেই কিছুদূর গেছে অমনি সুন্দরী সেই কুয়োর মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মকরকটী হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠল, মা, তুই আমায় ফেলে কোথায় গেলি? ঈশ্বরবর্মা কিছুদূর গিয়েছিল, এই কান্না শুনে সে বন্ধুদের নিয়ে তখনই সেখানে এসে হাজির হ'ল। মকরকটীর কান্না শুনে বাড়ির ঝি-চাকরগুলি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল। মকরকটী কাঁদতে কাঁদতেই মেয়েকে তুলতে চাকরদের কুয়োর মাঝে নামার হুকুম দিলে। ঈশ্বরবর্মা কম্পিত বক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কুয়োতে নামার একটু পরেই দু'টো চাকর সুন্দরীকে উপরে এনে বললে, ভগবানের দয়ায় এখনও বেঁচে আছে। সুন্দরী কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীনের মতো পড়ে রইল, তারপর যখন চেতনা ফিরে আসছে ব'লে মনে হ'ল তখন সে একদৃষ্টে ঈশ্বরবর্মার দিকে চেয়ে রইল। তারপর কথাও বলতে লাগল। সুন্দরী বেঁচে আছে দেখে ঈশ্বরবর্মা পরম খুশি হয়ে ভাবলে, সুন্দরী তাকে যথার্থই গভীরভাবে ভালবাসে। সুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য করতে যাওয়া-টাওয়া সব বন্ধ ক'রে দিয়ে সে বন্ধুদের নিয়ে নিজের বাসা বাড়িতে ফিরে এল।

বন্ধু অর্থদত্তের কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই ভাল লাগল না, সে ঈশ্বরবর্মাকে একান্তে পেয়ে বললে, ভাই এ কিন্তু ভাল করলে না, তোমার সুবর্ণদ্বীপে যাওয়াই উচিত ছিল। সুন্দরী তোমায় এত ভালবাসে যে, তুমি চলে গেলেই সে আত্মহত্যা করবে এ তুমি বিশ্বাস করো না, এ ওর মা মকরকটীর চালাকি, তোমাকে ভুলিয়ে তোমার সমস্ত অর্থ ও শোষণ ক'রে নিতে চায়। ওর কূটকৌশল তুমি বুঝতে পারছ না। এখনও সময় আছে, যা হাতে আছে তাই

নিয়ে স্বুবর্ণদ্বীপে চলো, সব ফুরিয়ে বাড়ি ফিরে গেলে তোমার বাবা কি বলবেন? ঈশ্বরবর্মা বন্ধুর কথা কানেই তুলল না, সুন্দরীর কুয়োয় পড়া দেখে তখন তার মাথা ঘুরে গেছে। সুতরাং সে কাঞ্চনপুরেই রয়ে গেল এবং যথারীতি সুন্দরীর বাড়িতে গিয়ে আমোদ-প্রমোদ করতে লাগল। মাস খানেকের মাঝে হাতে যা ছিল তা সব শেষ হয়ে গেল। আর সে-ও বড় যা-তা নয়, প্রায় দুই কোটি মোহর। মকরকটীর হাতে যখন আর মোহর তুলে দিতে পারল না ঈশ্বরবর্মা তখন মকরকটী তাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিলে।

বাণিজ্যে যাওয়া হ'ল না, সুতরাং ঈশ্বরবর্মা আর কোন্ মুখে বাড়ি ফিরবে, সুতরাং সে মনমরা হয়ে কাঞ্চনপুরেই রয়ে গেল। অর্থদত্ত এবং তার আর আর বন্ধুরা সব বাড়ি ফিরে গিয়ে ঈশ্বরবর্মার বাপ রত্নবর্মাকে সব কথা খুলে বললে। রত্নবর্মা বেশ কিছু বিরক্ত হয়ে কুটনী যমজিহ্বার সঙ্গে দেখা ক'রে বললেন, এক বৎসর ধরে কি শিখিয়েছ তুমি আমার ছেলেকে, তোমাকে এত অর্থ পুরস্কার দিলাম অথচ ছেলে আমার যে মূর্খ সেই মূর্খ-ই রয়ে গেছে। তাকে পাঁচ কোটি মোহর দিয়ে স্বুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য করতে পাঠিয়েছিলাম, পথে কাঞ্চনপুরের মকরকটী নামে এক কুটনী তাকে ভুলিয়ে সে সব মোহর আত্মসাৎ করেছে। এরপর মকরকটী কি ক'রে তার ছেলেকে বোকা বানিয়েছে সে-সব কিছু রত্নবর্মা যমজিহ্বাকে খুলে বললেন।

যমজিহ্বা রত্নবর্মার কথা শুনে একটু কি যেন ভাবলে, তারপর বললে, হাঁ আমারই ভুল হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আর একবার আপনার ছেলেকে আমার কাছে নিয়ে আস্থন, এবার আমি তাকে এমন কিছু শিখিয়ে দেব যে, সে আবার গিয়ে মকরকটীর যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করতে পারবে। আপনি দেখবেন এ ব্যবস্থা আমি করবই।

রত্নবর্মা যমজিহ্বার কথায় আশ্বস্ত হয়ে তাকে আবার অর্থ দিয়ে বাড়ি এসে অর্থদত্তকে পাঠালেন ছেলেকে আনতে। অর্থদত্ত কাঞ্চনপুরে গিয়ে বন্ধুকে মূর্খতার জন্য ভর্ৎসনা ক'রে, বাপ ক্ষমা করে তাকে আবার ডেকে পাঠিয়েছেন সে কথা জানিয়ে, যমজিহ্বা এবার আবার নতুন বিদ্যা শিখিয়ে দেবে ইত্যাদি ব'লে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে বাড়ি নিয়ে এল। ঈশ্বরবর্মা অবশ্য একটু ভয়ে ভয়েই বাপের কাছে এল, কিন্তু সে বাপের একমাত্র ছেলে ব'লে বাপ আর কিছু তাকে বললেন না। তিনি আবার তাকে কুটনী যমজিহ্বার কাছে নিয়ে গেলেন।

যমজিহ্বা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার কাছে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনার পর ঈশ্বরবর্মাকে বললে, তোমার দোষ নেই, দোষ আমারই, আমার ভুল হয়ে গেছল ও বিদ্যাটা তোমায় শেখাতে, কুটনীরা কুয়োর মাঝে আগে থেকে জাল পেতে রাখে যাতে কেউ যদি ওর মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে, তবুও মরে না। যা'ক, যা হবার তা' ত হয়েই গেছে, এবার এর আমি প্রতিকার করছি। এই ব'লে যমজিহ্বা তখন তার চাকরদের ডেকে বললে, এরে, কে আছিস্, আমাদের আলকে একবার নিয়ে আয় ত !

একটা চাকর তখনই একটা বানরকে সেখানে নিয়ে এল। যমজিহ্বা তখন ঘরে গিয়ে এক তোড়া মোহর নিয়ে এসে সেগুলি মেঝেতে ঢেলে ফেলে বানরকে বললে,—আল, এগুলি গিলে ফেল ত! বানরটি তখনই সেগুলি গিলে ফেললে। যমজিহ্বা তখন রত্নবর্মাকে দেখিয়ে তাকে বললে, এঁকে পঁচিশটা দে। আল তখনই মুখ থেকে পঁচিশটা মোহর বের ক'রে রত্নবর্মাকে দিলে। এরপর ঈশ্বরবর্মাকে দেখিয়ে বললে, এঁকে পঞ্চাশটা দে। আল তখনই পঞ্চাশটা মোহর নিজের পেট থেকে বের ক'রে ঈশ্বরবর্মাকে দিলে। এরপর আর যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাদের সবাইকে অমনি গুণে গুণে মোহর দিতে আলকে হুকুম করলে। আল তখনই

তাই করলে, গুণতে তার একটুও ভুল হ'ল না। রত্নবর্মা পুত্রের সঙ্গে অবাক্ হয়ে বানরের কীর্তি দেখতে লাগলেন।

যমজিহ্বা তখন ঈশ্বরবর্মাকে বললে, দেখলে ত আমার বানরের গুণ। এবার এই বানরটিকে তোমায় দিচ্ছি, এই বানর নিয়ে আবার তুমি কাঞ্চনপুরে সুন্দরীর বাড়ি যাও। আগে থেকেই একে বেশ কিছু মোহর গলাধঃকরণ করিয়ে রাখবে, তারপর তোমার যখনই অর্থের দরকার হবে সুন্দরী আর মকরকটীর সামনে তখনই আলকে তাই বের ক'রে দিতে হুকুম করবে। ওরা কয়েকবার ঐ রকম দেখলেই ভাববে, এ বানর নিশ্চয়ই চিন্তামণি। তখন তাদের যথাসর্বস্ব দিয়ে তোমার কাছ থেকে এ বানরটিকে নিতে চাইবে। ওরা এই রকম করলেই তুমি বানরটি ওদের দিয়ে ওদের যথাসর্বস্ব নিয়ে তুমি ওখান থেকে সরে পড়বে। এই ব'লে যমজিহ্বা বানরটি ঈশ্বরবর্মাকে দিয়ে দিলে। রত্নবর্মা দুই কোটি মোহর যমজিহ্বাকে বানরটির মূল্যস্বরূপ দিয়ে দিলেন।

এবার আবার কাঞ্চনপুর যাত্রার পালা। ঈশ্বরবর্মা পিতৃদত্ত আরও কিছু অর্থ, আল, অর্থদত্ত এবং অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে আবার কাঞ্চনপুরে সুন্দরীর বাড়িতে এসে হাজির হ'ল। ঈশ্বরবর্মা বাপের কাছ থেকে যে-সব ধনরত্ন, অর্থ নিয়ে এসেছিল সে সব কিছুই সুন্দরীর হাতে তুলে দিলে, সুন্দরী ঈশ্বরবর্মাকে আগের চেয়েও বেশি আদর-যত্ন, ভালবাসা দেখাতে লাগল। বাড়ি থেকে আনা সব অর্থই সুন্দরীর হাতে তুলে দেওয়াতে—নিজে খরচের জন্য যখন কিছু অর্থের প্রয়োজন হ'ল তখন বন্ধু অর্থদত্তকে সে ডেকে বললে, ভাই, আলকে একবার নিয়ে এসো ত! অর্থদত্ত বন্ধুর কথামতো আলকে এনে হাজির ক'রলে ঈশ্বরবর্মা তাকে বললে, পুত্র, আজ আমাদের খাওয়াদাওয়ার জন্য তিন শো, তাম্বুল ইত্যাদির জন্য একশো, মাসী মকরকটীর জন্য একশো আর ব্রাহ্মণদের দান করবার জন্য একশো মোহর দাও ত!

বানরটিকে বহু আগেই অনেক মোহর গিলিয়ে রাখা হয়েছিল, এখন ঈশ্বরবর্মার কথায় সে নিজের পেট থেকে একে একে নির্দিষ্ট মোহর উগরে দিতে লাগল। দেখে সুন্দরী আর তার মা ত একেবারে হতবাক্। ওরা একান্তে গিয়ে মায়ে-ঝিয়ে বলাবলি করতে লাগল: কই এমনটি ত কোথাও দেখিনি, কখনো শুনিওনি। আসলে বোধ হয় এ বানর নয়, ছদ্মবেশী চিন্তামণি। একে যদি আমরা বাগাতে পারি তা হ'লে আমাদের সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়। মকরকটী মেয়েকে বললে, দেখ্ না তুই একবার বলে-কয়ে, আব্দার ক'রে। মেয়ে বললে, তুমি ভেবো না, মা,—যেমন ক'রে হ'ক এ বানরটা আমি আদায় করছিই।

এরপর আহারাদির পর ঈশ্বরবর্মা যখন বিশ্রাম করতে বসেছে তখন সুন্দরী তার জন্যে তাম্বুল নিয়ে এসে তার পাশে বসে বললে, একটা আব্দার করবো, রাখবে?—এতেই বুঝবো তুমি আমায় কেমন ভালবাস!

—কি, বলো।

সুন্দরী মধুর হেসে আব্দারের ভঙ্গীতে চেয়ে বললে,—তোমার ঐ বানরটি আমায় দেবে?

—পাগল!

—পাগল কেন, আমায় এত কিছু দিচ্ছ—আর ঐটাই দিতে পারবে না!

—ও যে আমার বাপের সর্বস্ব, ওকে কাউকে উপহার দেওয়া চলে না।

—পাঁচ কোটি মোহর দিচ্ছি তোমায় আমি।

এবার ঈশ্বরবর্মার হাসার পালা, সে হেসে বললে, হাসালে তুমি, পাঁচ কোটি কেন,—তোমার যথাসর্বস্ব এবং তার সঙ্গে এই নগরটি পেলেও ওকে দেওয়া চলে না।

এই কথা শুনে সুন্দরী উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঈশ্বরবর্মার পায়ে পড়ে

কাঁদতে কাঁদতে বললে—তোমাকে আমার যথাসর্বস্ব দিচ্ছি, আমায় তুমি ভালবাসো বলো, আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে এই বানরটি আমায় দিয়ে দাও।

অর্থদত্ত এবং ঈশ্বরবর্মার আর আর বন্ধুরা পাশেই ছিল, তারা তখন ঈশ্বরবর্মার কাছে এগিয়ে এসে বললে, সুন্দরী যখন এমন কান্নাকাটি করছে তখন দিয়েই দাও না, ভাই, বানরটি ওকে পরে যা হয় হবে।

ঈশ্বরবর্মা তখন যেন তাদের কথায় রাজী হয়ে বললে,—তোমরাও যখন বলছ, আর ও-ও যখন কান্নাকাটি করছে তখন আর আমি না বলি কি ক'রে ?

সুন্দরী তখন খুশি হয়ে তার পা ছেড়ে দিয়ে চোখের জল মুছে তার মার কাছে সুখবরটা বলতে গেল।

ঈশ্বরবর্মা সেদিন ওখানে বেশ আমোদ-আহ্লাদে কাটিয়ে পরের দিন ভোরে বানরটি সুন্দরীকে দিয়ে—তার যথাসর্বস্ব এমন কি তার ভদ্রাসন পর্যন্ত বিক্রী ক'রে অর্থ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য করতে চলে গেল।

এদিকে প্রথম দুইদিন মোহর চাইলেই বানর সুন্দরীকে হাজার হাজার মোহর দিল, তৃতীয় দিন সে আর কিছু দিতে পারল না দেখে সুন্দরী আর মকরকটী দুইজনেই তাকে লাঠি দিয়ে মারতে লাগল, মাটিতে আছাড় দিতে লাগল। বানর এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ওদের দুজনেরই নাকমুখ কামড়ে ক্ষতবিক্ষত ক'রে দিলে। এতে মকরকটী ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে একটা মুগুরের ঘায়ে বানরটাকে একেবারে শেষ করলে। অপরকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে মকরকটী জাল পেতেছিল, সেই ফাঁদে সে নিজে পড়ে সর্বস্বান্ত হ'ল শুনে নগরবাসীরা তা নিয়ে নানা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগল। এদিকে বানরে আঁচড়ে কামড়ে সুন্দরীর মুখ বিকৃত করে দিয়েছিল, তার উপর অর্থনাশ এবং মায়ের দেওয়া যন্ত্রণা

এ-সব সহ্য করতে না পেরে সুন্দরী আত্মহত্যা ক'রে তার সকল জ্বালা জুড়ালে।

আর ঈশ্বরবর্মা ?

সে এবার সুবর্ণদ্বীপে বাণিজ্য ক'রে প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে বাড়ি ফিরে এলে রত্নবর্মা ভাল একটা মেয়ে দেখে তার বিয়ে দিলেন।

আর ?

আর যমজিহ্বাকে দিলেন তিনি অনেক মোহর পুরস্কার।

দুই ধূর্তের উপাখ্যান

অনেকদিন আগের কথা।

রত্নপুর নামে একটা নগর ছিল, আর নগরের নামটাও কিছু নিরর্থক নয়। কারণ, সেখানকার অনেকের ঘরেই অনেক ধনরত্ন ছিল। কিন্তু হ'লে হবে কি, সেখানে শিব আর মাধব নামে দুই ধূর্ত প্রবঞ্চক ছিল। তারা কিছুদিনের মাঝেই রত্নেভরা রত্নপুরকে একেবারে রত্নশূন্য ক'রে তুললো। সম্পত্তিপন্ন লোকেরা এদের পাল্লায় পড়ে একরকম পথের ভিখারী হয়ে গেল বললেই হয়।

রত্নপুর নগরকে রত্নশূন্য ক'রবার পর শিব আর মাধব দুইজন নিজেদের মধ্যে বলাবলি ক'রতে লাগল,—এখানে থেকে আর কি লাভ,—এখানকার গৃহস্থদের যে রস ছিল তা আমরা শুষে তাদের একেবারে ছিবড়ে ক'রে দিয়েছি, এবার চলো অন্য কোথাও যাওয়া যাক।

—কোথায়?

কেন, উজ্জয়িনীতে। সেখানে শুনেছি অনেক লোকেরই অনেক ধনরত্ন আছে, আমাদের ব্যবসা বেশ কিছুদিন ভালভাবে চলবে। আর শুনেছি সেখানে শঙ্কর স্বামী ব'লে রাজার যে পুরোহিত আছে তার না-কি অনেক নগদ ধন আছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, পূজা-আর্চা নিয়ে থাকে, নিতান্ত ভালমানুষ, তাকে আমরা অনায়াসে ঠকিয়ে তার ধন আত্মসাৎ করতে পারবো। তাছাড়া, শুনেছি তার একটা সুন্দরী মেয়েও আছে, কোন-না-কোন কৌশলে তাকে বিয়ে ক'রে ব্রাহ্মণের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করাও অসুবিধা হবে না।

দুই ধূর্ত এই রকম যুক্তি ক'রে একদিন উজ্জয়িনীর দিকে রওয়ানা হ'ল। যথাসময়ে তারা উজ্জয়িনীতে হাজির হয়ে দুইজনে বিভিন্ন ছদ্মবেশ ধারণ করলে। মাধব সাজল এক রাজপুত্র,

রাজপুত্র সেজে সে নগরের পাশেই একটা গ্রামে বাস করতে লাগল। আর শিব সাজল এক তপস্বী : গায়ে ভস্ম মেখে, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ঝুলিয়ে, কপালে রক্তচন্দনের তিলক কেটে দিব্যি সন্ন্যাসী সেজে সে শিপ্রানদীর তীরে এক কৃত্রিম আশ্রম বানিয়ে বাস করতে লাগল। তার আশ্রমে তপস্বীরা যে সব জিনিস সচরাচর ব্যবহার করে তার কোন কিছুরই অভাব দেখা গেল না : দণ্ড, কমণ্ডলু, মৃগচর্ম, বল্কল সব কিছুর যোগাড় ক'রে দস্তুরমতো এক তপস্বী সেজে বসল সে। আর তপস্যারই বা কি ঘটা, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, স্নানের পর গায়ে মাটি মাখা, চোখ বুজে ধ্যান, কথা বলে না, ভিক্ষার চাল কিছুটা নিজে খেয়ে বাকীটা ছড়িয়ে পাখীদের খেতে দেয়। দেখে দেখে লোকের একেবারে তাক লেগে গেল। সবাই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—এমন মহাতপা সন্ন্যাসী, কই, আর কোনদিন আমাদের ত কখনও চোখে পড়েনি। ইনি যেন সাক্ষাৎ মহাদেব।

কপট তপস্বীর খ্যাতি লোকমুখে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে রাজবেশী মাধব একদিন কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এসে ঐ তপস্বীর আশ্রমের কাছেই এক দেবালয়ে আশ্রয় নিলে। শিপ্রানদীর তীরে তপস্বীর আশ্রম। মাধব একদিন স্নান ক'রে তপস্বীর আশ্রমে এসে ধ্যানমগ্ন কপট তপস্বীর চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে সমবেত অন্যান্য লোকের সামনে উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল, এমন তপস্বীকে দেখে ধন্য হয়ে গেল আমার জীবন, বহুবার বহু তীর্থ ঘুরেছি আমি, কই, এমন মহাতপস্বী ত আমার কোনদিন চোখে পড়েনি।

রাত্রে মাধব একা ভণ্ড তপস্বীর আশ্রমে এসে গোপনে অনেক শলাপরামর্শ ক'রে গেল। পরদিন ভোরে সে নিজের এক অনুচরের হাতে এক জোড়া ভাল কাপড় দিয়ে তাকে রাজপুরোহিত শঙ্কর স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলে। মাধবের কথামতো অনুচরটি শঙ্কর স্বামীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে প্রণাম ক'রে বললে,

দাক্ষিণাত্য থেকে মাধব নামে এক রাজা এসেছেন আপনাদের ঐ উজ্জয়িনীতে। শত্রুগণ তাঁর রাজ্য আক্রমণ করাতে মাত্র কয়েকজন অনুচর এবং প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে এসেছেন তিনি এখানে। এখানকার রাজার সঙ্গে পরিচিত হ'তে চান তিনি। কারণ তিনি মনে করেন উজ্জয়িনীরাজের সঙ্গে পরিচয় হ'লে তাঁর সাহায্যে পরে তিনি তাঁর হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবেন। রাজার সঙ্গে পরিচয় সহজ হবে যদি আপনার সঙ্গে আগে পরিচয় হয়, কারণ রাজসভায় আপনার বিশেষ প্রতিপত্তি। এই ভেবে আপনার সঙ্গে পরিচয় করার জন্মে এই মূল্যবান কাপড় জোড়া আপনাকে প্রণামী পাঠিয়েছেন, গ্রহণ ক'রে তাঁকে ধন্য করুন।

স্তোকবাক্য শুনলে অতি চতুর লোকেরও মন গলে গিয়ে সে কেমন বোকা বনে যায়, ভালমানুষ রাজপুরোহিতের মন গলবে, তাতে আর কথা কি, তিনি বস্ত্রবাহককে সমাদর ক'রে তার হাত থেকে কাপড় জোড়া গ্রহণ করলেন। অনুচর আর দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না ক'রে মাধবের কাছে ফিরে গেল।

পরদিন কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে মাধব নিজেই পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে এল। শঙ্কর স্বামী রাজা মাধবের পরিচয় পেয়ে তাকে যথেষ্ট আপ্যায়ন ক'রে কথা বললেন। পরের দিনও মাধব কয়েকজন অনুচর এবং দামী কাপড়ের সঙ্গে আরও অনেক ভাল জিনিস উপহার নিয়ে পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করতে এল। পুরোহিত বড় খুশি। মাধব বললে, আপনি উজ্জয়িনীরাজের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে না দিলে আমার আর পরিচয়ের সম্ভাবনা নেই, আপনি দয়া ক'রে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিন। পুরোহিত সেইদিনই মাধবকে রাজবাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাজার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাধবের চেহারাটা বেশ ভালই ছিল, রাজারই মতো, তাছাড়া, বেশভূষাও

রাজার মতো, সুতরাং রাজার মনে আর কোন রকম সন্দেহ রইল না। তিনি মাধবকে সত্যিকার রাজা মনে ক'রে যথোচিত সম্মান দেখিয়ে ঐখানেই থাকতে বললেন। বললেন, যথাসময়ে সুযোগ-মতো আপনার হৃতরাজ্য উদ্ধারে সাহায্য করা যাবে।

মাধব রাজার অনুগ্রহে কৃতার্থ হয়ে রাজদত্ত বৃত্তি নিয়ে সেইখানেই বাস করতে লাগল।

সেই থেকে মাধব রাজবাড়িতেই নিজের আস্তানা ক'রে নিল। সে দিনের বেলাতে রাজবাড়িতে থাকে, আর রাত্রে লুকিয়ে গিয়ে কপট তপস্বী শিবের সঙ্গে দেখা ক'রে নানা যুক্তি-পরামর্শ করে। এদিকে পুরোহিত শঙ্কর স্বামীর সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় একদিন তিনি মাধবকে নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকতেই অনুরোধ করলেন। মাধব খুশি হয়ে পুরোহিতের সে অনুরোধ রাখলে। ওখানে থাকবার সময় মাধব কিছু নকল মণিমাণিক্যের অলংকার সংগ্রহ ক'রে পুরোহিতকে দেখিয়ে তা নিজের কাছেই রাখলে। পুরোহিত তা দেখার পর থেকে তাকে আরও বেশি আদর-যত্ন করতে লাগলেন। কিছুদিন এই রকম আদর-যত্ন ভোগ করবার পর মাধব অসুস্থতার ভাণ ক'রে খাওয়া একরকম ছেড়ে দিল বললেই হয়, ফলে সে দেখতে অনেক রোগা হয়ে গেল। এই সময় সে একদিন শঙ্কর স্বামীকে কাছে ডেকে বললে, দেখুন, আমার শরীরের যে অবস্থা হচ্ছে দিন দিন, তাতে মনে হচ্ছে আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। আপনি এতই করলেন, এখন যদি কোন ভাল বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে আমার কাছে আনতে পারেন তা হ'লে তাঁকে আমার যথাসর্বস্ব দান করে দেখি যদি আমার রোগমুক্তি হয়। শঙ্কর স্বামী নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুঁজে খুঁজে কয়েকজন নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণকে একে একে তার কাছে নিয়ে এলেন, কিন্তু কোন ব্রাহ্মণকেই মাধবের পছন্দ হয় না। মাধবের যে সব অনুচর ছিল তাদের অনেকে বাইরে থাকলেও কয়েজন তার সঙ্গেই

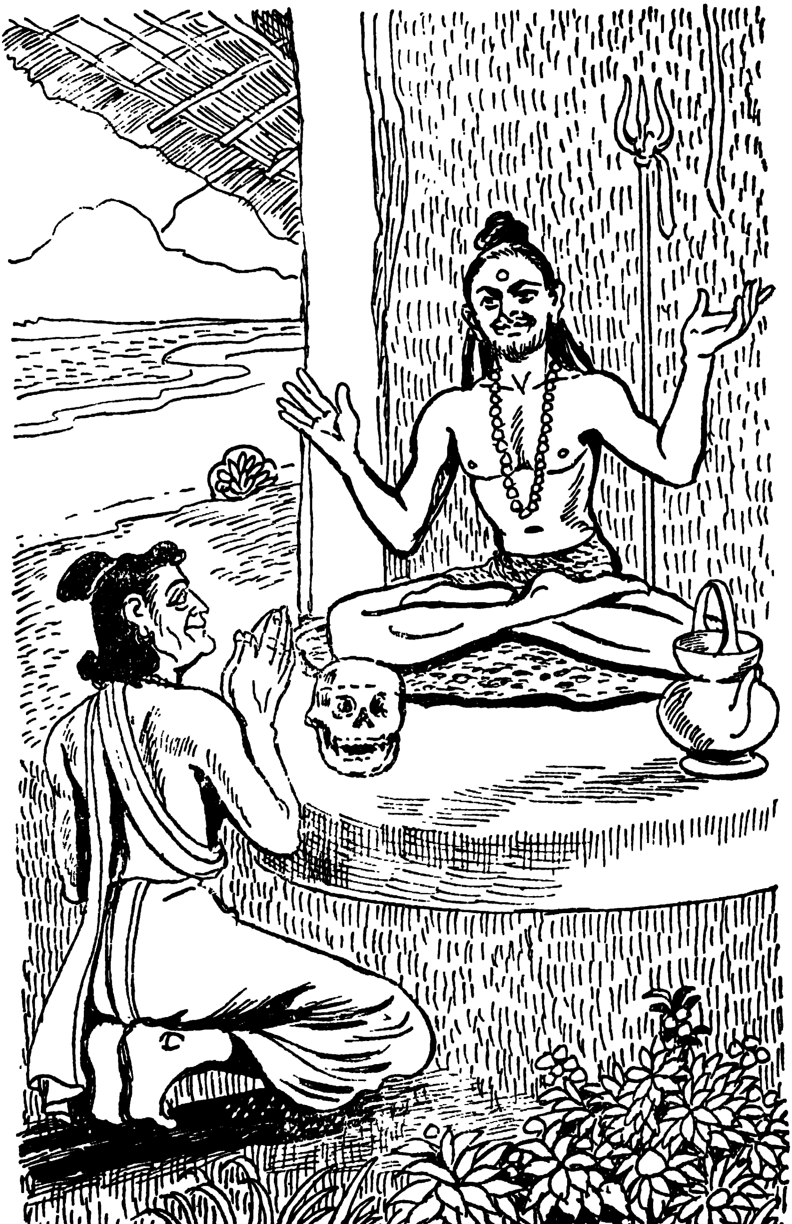
থাকত, তাদের একজন একদিন শঙ্কর স্বামীকে বললে, দেখুন, এ সব ব্রাহ্মণদের ওপর যখন এঁর শ্রদ্ধা হচ্ছে না, তখন আপনি এক কাজ করুন: আমরা দেখেছি শিপ্রানদীর তীরে আশ্রম বানিয়ে এক তপস্বী বাস করেন, আমাদের ধারণা তাঁর মতো বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ আর এ তল্লাটে পাওয়া যাবে না। তিনি আসবেন কি-না জানি না, তবে সেখানে গিয়ে তাঁকে একবার অনুরোধ ক'রে দেখতে পারেন।

অনুচরের কথা শুনে শঙ্কর স্বামী তখনই শিপ্রানদীর তীরে সেই আশ্রমে গিয়ে হাজির হ'লেন। কপট সন্ন্যাসী শিব তখন চোখ বুজে ধ্যানের ভাণ ক'রে ব'সে ছিল। শঙ্কর স্বামী তার কাছে গিয়ে বললে, দেবতা, আমি একটা কথা বলতে এসেছি।

প্রথম কয়েকবার সাড়াই দিলে না তপস্বী। কয়েকবার বলতে শেষে বোজা চোখ খুলে শঙ্কর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললে, বলুন, কি বলতে চান।

শঙ্কর স্বামী তখন বললেন, দেবতা, আমি এসেছি আপনার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে। কথাটা খুলেই বলি: আমি উজ্জয়িনীতে থাকি, রাজপুরোহিত, নাম শঙ্কর স্বামী। কিছুদিন হ'ল দাক্ষিণাত্যের এক রাজা এসে আমার বাড়িতে আছেন। তাঁর ভীষণ অসুখ। জীবনে নিরাশ হয়ে তিনি তাঁর যাবতীয় ধনরত্ন একজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করতে চান,—যদি তাতেই তাঁর রোগ নিরাময় হয়। কয়েকজন ব্রাহ্মণকে আমি অবশ্য নিয়ে এসেছিলাম তাঁর কাছে, দেখে তাঁর শ্রদ্ধা হয়নি। তিনি আজ আপনার নাম শুনে আপনাকেই তাঁর যথাসর্বস্ব দান করতে অভিলাষী হয়েছেন।

কপট তপস্বী শঙ্কর স্বামীর কথার জবাবে বললে, দেখুন, আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, ভিক্ষাই আমাদের জীবিকা, অনর্থক অর্থ নিয়ে আমি কি করবো? অর্থ অনর্থের মূল, বিশেষ ক'রে যারা ধর্মজীবন যাপন করতে চায়।



শঙ্কর স্বামী তখন বললেন, দেবতা, আমি এসেছি আপনার কাছে একটা প্রার্থনা নিয়ে

শঙ্কর স্বামী বললেন, প্রভু, এমন কথা বলবেন না। আপনি জ্ঞানী লোক, আপনার কি জানা নেই, লোকে গার্হস্থ্য আশ্রমে থেকে বিবাহ ইত্যাদি ক'রে অতিথি এবং পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন ক'রেও ত্রিবর্গ লাভ করতে পারে ?

কপট তপস্বী শিব উত্তর দিলে, মশায়, আমি দারপরিগ্রহ করি নি, আর যে, কোন লোকের কন্যাও আমি কোনদিন গ্রহণ করতে পারব না, সুতরাং ধন দিয়ে আমি কি ক'রবো ?

তপস্বীর কথা শুনে শঙ্কর স্বামীর মনে হ'ল—ভাল হ'ল, এই তপস্বী এখনও বিবাহ করেন নাই, অথচ বিবাহ ক'রবার ইচ্ছা যে একেবারে নেই, কথা শুনে তা মনে হ'ল না, আর একটু চেষ্টা ক'রে মত করাতে পারলেই রাজা মাধবের ধনরত্নও ইনি পেতে পারবেন। সুতরাং এমন সুযোগ ছাড়া ঠিক হবে না, দেখা যাক ব'লে কয়ে, আমার কন্যাটিকে যদি এঁকে গ্রহণ করাতে পারি! শঙ্কর স্বামী তখন স্নিগ্ধ-মধুরকণ্ঠে তপস্বীকে বললেন, দেবতা, আমি একটা অনুরোধ করতে চাই।

—কি, বলুন ?

—আমার নিজের একটি কন্যা আছে, পরমা সুন্দরী সে। আমার একান্ত ইচ্ছা কন্যাটিকে আপনার হাতে সম্প্রদান করি। আর রাজা মাধব আপনাকে যে ধনরত্ন দিতে চাইছেন তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও আপনার কোন ঝক্কি পোহাতে হবে না, আপনার অভিপ্রায় হ'লে আমিই তা রক্ষা ক'রবো, সুতরাং আমার একান্ত অনুরোধ, আমার সুন্দরী কন্যা এবং রাজা মাধবের ধনরত্ন গ্রহণ ক'রে আপনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করুন। এতেও আপনার ধর্মলাভ হবে।

শঙ্কর স্বামীর কথা শুনে তপস্বী মনে মনে রীতিমতো খুশি হয়, কিন্তু বাইরে গম্ভীর প্রশান্ত ভাব দেখিয়ে বললে, আমাকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করাতে যদি আপনার এতই আগ্রহ হয়ে থাকে তবে আমি

আপনার কথায় রাজী হচ্ছি, কিন্তু একটি কথা আগে থেকেই ব'লে রাখি,—আমি শৈশব থেকেই তপস্বী, গৃহস্থাশ্রমের মর্ম-ধর্ম কিছুই আমার জানা নেই। সোনা রূপো মণিমাণিক্য কি রকম দেখতে, কি তার কাজ, কিছুই জানি না আমি, ও সব আপনাকেই দেখাশুনা করতে হবে, যদি তা পারেন, তাহলে আমি আপনার অনুরোধ রাখতে পারি।

সরল ব্রাহ্মণ শঙ্কর স্বামী কপট তপস্বীর কথায় বিশ্বাস ক'রে খুশি হয়ে পরম সমাদরে তাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মাধবের কাছে তপস্বীর সকল কথা খুলে বললে—মাধব যেন তপস্বীকে দেখে খুব খুশি হয়েছে এমন ভাণ ক'রে তার যথাসর্বস্ব তপস্বীকে দান করলে। পুরোহিত এর পর তপস্বীকে নিজের কন্যাটি সম্প্রদান করলেন। তপস্বী তখন মাধবের কাছ থেকে পাওয়া ধনরত্ন পুরোহিত শ্বশুরের কাছে রাখতে দিয়ে বললে,—আমি ত আগেই বলেছি, আমি এ সবের মর্ম কিছুই বুঝি না, এ সব আপনার কাছেই রাখুন, দেখাশুনা করুন।

পুরোহিত সেগুলি নিয়ে বললে, বাবাজী, এ নিয়ে তোমার কোনো দুশ্চিন্তা ক'রবার নেই, এ সব আমি আমার ঘরে তুলে রাখছি। রক্ষণাবেক্ষণ আমিই ক'রবো। ধূর্ত তপস্বী সে কথার আর কোনো উত্তর দিল না।

এদিকে মাধব তার সর্বস্ব কপট তপস্বীকে দান করবার পর থেকেই তার রোগের ভাণ ত্যাগ ক'রে আবার আগের মতো আহারাদি গ্রহণ করে সবল হয়ে উঠল। তখন সে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, দেখেছেন, সৎপাত্রে দানের কি মহিমা, আমি যে আবার রোগমুক্ত হয়ে বেঁচে উঠলাম, এর মূল হচ্ছেন এই তপস্বী। একেবারে সত্যিকার বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ইনি। এঁকে দান করতে পেয়েই আমি প্রাণ পেলাম, সুতরাং এখন থেকে ইনি আমার প্রিয়তম বন্ধু।

বন্ধুত্বের কথা যখন ঘোষিত হয়ে গেল তখন শিব আর মাধবের মধ্যে মেলামেশার আর কোন বাধা রইল না। দুই ধূর্ত পুরোহিতের ঘরে বেশ সুখেই বসবাস করতে লাগল, এবং সুযোগমতো গোপনে নানা শলাপরামর্শ করতে লাগল। কিছুদিন এমনি কাটবার পর একদিন শিব তার শ্বশুর পুরোহিতকে বললে, অনেকদিন ত বসে বসে আপনার অন্ন ধ্বংস করা গেল,—এবার ভাবছি আপনার উপর আর চাপা না দিয়ে নিজের ব্যয়েই নিজের ভরণপোষণ করবো। রাজা মাধবদত্তের যে-সব ধনরত্ন আপনার কাছে রাখতে দিয়েছি আপনি যদি সেগুলি নিয়ে তার উপযুক্ত মূল্য কিংবা তার চেয়ে কিছু কমও আমাকে দেন তা হ'লে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়।

পুরোহিত ভাবলেন, রাজা মাধবের দেওয়া আমার জামাইয়ের যে-সব ধনরত্ন, মণিমাণিক্য আমার বাড়িতে আছে—আমি পুরোহিত ব্রাহ্মণ, সেগুলির মূল্য নির্ণয় করা আমার সাধ্য নয়, আসলে সে-সব রাজার ধন—অমূল্য রত্ন। ও-গুলির বিনিময়ে যদি আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি ওকে দান করি, তা হ'লেও মনে হয় আমার লোকসান হবে না। জামাই শিবের কাছে এই প্রস্তাব করলে সে তাতেই রাজী হয়ে গেল। দুইজন তখন পরস্পরকে এক একখানা লিখ্য-পত্র দান করে নিশ্চিন্ত হ'লেন। শিব ও মাধব দুইবন্ধু তখন পুরোহিতের বাড়িতে থেকেই তাঁর বিপুল সম্পত্তি সুখে ভোগ করতে লাগল।

কিছুদিন বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই কেটে গেল।

তারপর ?

তারপর একদিন পুরোহিতের কিছু বেশি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় জামাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া মূল্যবান অলংকার নিয়ে নগরের এক বিখ্যাত জহুরীর কাছে বিক্রী করতে গেলেন। জহুরীর খুব বড় ব্যবসা, অনেক সুদক্ষ রত্ন-পরীক্ষক আছে তার দোকানে। পুরোহিত যে রত্নখচিত অলংকারটি নিয়ে গিয়েছিলেন,

দোকানদার তার সবচেয়ে পাকা রত্ন-পরীক্ষককে তা পরীক্ষা করতে দিল। পরীক্ষক তা নানারকম পরীক্ষার পর পুরোহিতকে বললে, আপনার এ অলংকার কোথায় পেলেন, এতে যে মণিরত্ন রয়েছে তা সবই মেকি, সবই কাচ আর স্ফটিক। হঠাৎ দেখে অবশ্য বোধ হয় এ মণিকাঞ্চন দিয়ে তৈরি, কিন্তু ও দুয়ের বিন্দুমাত্র সংশ্রব নেই এতে।

শুনে পুরোহিতের মন ত রীতিমতো খারাপ হয়ে গেল। ভারাক্রান্ত মনে তিনি বাড়ি এসে জামাইয়ের দেওয়া সমস্ত অলংকার নিয়ে জহুরীর দোকানে এলেন। ওখানকার রত্ন-পরীক্ষক ও আর-আর অনেক জহুরীরা সে সব পরীক্ষা ক'রে বললে, সেগুলি সবই মেকি। শুনে শঙ্কর স্বামীর মাথায় ত একেবারে আকাশ ভেঙে পড়ল। তিনি তখনই বাড়ি এসে জামাই শিবকে বললেন,—বাপু, তোমাব অলংকারগুলি তুমি নিয়ে আমার ধন ফেরত দাও। শিব উত্তর করলে, সে কি মশায়, আমি জিনিস দিয়েছি, আপনি ধন দিয়েছেন। এই আদান-প্রদান বহুদিন হ'ল হয়ে গেছে। আর আমার জিনিস নিয়ে যে ধন আপনি আমায় দিয়েছিলেন তা কি এতদিন বসে আছে? আমার দরকারমতো সে সব আমি খরচ করে ফেলেছি না! এখন আপনি বললেই আমি সে ধন ফেরত দিই কি ক'রে? এ আপনার অন্যায় কথা।

শুনে পুরোহিতের আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলে উঠল। অনেক তিক্ত কথা বেরুল তাঁর মুখ থেকে, প্রত্যুত্তরে শিবও অনেক তিক্ত কথা বললে শ্বশুরকে। দু'জনে ভীষণ বিবাদ। অর্থ ফিরে পাওয়ার আর কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে পুরোহিত ছুটলেন রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে।

কপট রাজা মাধব পুরোহিতের বাড়িতে থাকত বটে, কিন্তু উজ্জয়িনীরাজ দরবার করতে বসলে সে সেখানে গিয়ে জুটতো। প্রতিদিনের অভ্যাস মতো সে সেদিন রাজসভাতেই বসে ছিল। এমন

সময় পুরোহিত হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে বললেন, মহারাজ, একটা বড় লজ্জাকর ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে আসতে হ'ল, আপনি সুবিচার করুন।

—কি ব্যাপার, লজ্জাই বা কিসের ?

পুরোহিত উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন, আমি আমার একমাত্র জামাই শিবের নামে নালিশ নিয়ে এসেছি আপনার কাছে।

—কেন ?

—জামাই শিব আমাকে কতকগুলি অলংকার দিয়ে আমার কাছ থেকে আমার যথাসর্বস্ব নিয়েছে। এ-সব অনেকদিন আগের কথা। হঠাৎ আমার কিছু অর্থের দরকার হওয়ায় আমি যখন একখানা অলংকার জহুরীর কাছে নিয়ে গেলাম তখন তারা তা পরীক্ষা ক'রে বললে সে একেবারেই মেকি। তখন সবগুলিই নিয়ে গেলাম সেখানে, তারা দেখে বললে যে, সবগুলিই মেকি। আমি ফিরে এসে জামাইকে ব'ললাম,—তোমার দেওয়া সব অলংকার ঝুটো, তুমি তোমার অলংকার ফেরত নিয়ে আমার ধন ফেরত দাও। এখন সে তা আমায় ফেরত না দিয়ে আমায় যা-তা কথা বলছে। মহারাজ, আপনি এর একটা সুবিচার করুন।

শিবও তখন এসে গেছে সেখানে। পুরোহিতের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে রাজার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে,—মহারাজ, এবার আমার কথা শুনুন। সকলেই জানেন আমি ছেলেবেলা থেকে তপস্যা করে আসছিলাম,—সংসারে ভাল মন্দ কোন কিছুর সঙ্গে আমার সংস্রব ছিল না। কোনরকম দান প্রতিগ্রহও আমি ক'রতাম না। এই পুরোহিতই ধরে বেঁধে আমায় সংসারী করেছেন। যে অলংকার মেকি বলে উনি আপনার কাছে আমার নামে নালিশ করছেন—ও-গুলিও আমার পৈতৃক ধন নয়, আর হ'লেও বা, তপস্বী ছিলাম আমি, তা রাখব কেন আমার কাছে। পুরোহিত নিজেই আমাকে রাজা মাধবের রোগমুক্তি কামনায় ঐ অলংকারগুলি তাঁর

কাছ থেকে দান নিতে বাধ্য করান। ও-গুলি খাঁটি কি মেকি তা তপস্বী মানুষ আমি, বুঝবো কেমন ক'রে। মহারাজ, আপনিই বিচার ক'রে বলুন, আমি দোষী কিনা, আর রাজা মাধবও এখানে রয়েছেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেই আমার কথার সত্যাসত্য নির্ণয় ক'রতে পারবেন।

উজ্জয়িনী-রাজ দুই পক্ষের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন। এই সময় ধূর্ত মাধব তার মুখ খুললে। সে দাক্ষিণাত্যের রাজা সেজে রাজসভায় বসেছে, সুতরাং রাজোচিত গাম্ভীর্য নিয়ে পুরোহিতকে সম্বোধন ক'রে বললে, ঠাকুর মশায়, আমি আপনাকে বিশেষ মান্য করি, শ্রদ্ধা করি, সুতরাং আপনাকে কোনরকম প্রবঞ্চনা করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। এখন দেখছি আপনাদের দু'জনার যা নিয়ে বিবাদ হচ্ছে তার মূল আমি। কারণ আমিই তপস্বী শিবকে রোগমুক্তির জন্য ও-গুলি দান করেছিলাম। অবশ্য এ ব্যাপারে আমারও কোন দোষ নেই। ও-গুলি আমার পৈতৃক ধনরত্ন, শত্রুভয়ে রাজ্য থেকে পালিয়ে আসবার সময় ও-গুলি আমি সঙ্গে নিয়ে আসি। কিন্তু আমি ভাবছি, ও-গুলি কৃত্রিমই বা হবে কি ক'রে, কৃত্রিম হ'লে কি আর ও-গুলি দানের ফলে আমি অমন কঠিন রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতাম! আপনি নিজেই ত জানেন, ও-গুলি ব্রাহ্মণকে দান করবার ফলেই আমি রোগমুক্ত হয়েছি। আমি সত্য কথা বলছি কি-না আপনিই ভেবে দেখুন!

পুরোহিত এ-কথার আর কোন জবাব দিতে পারলেন না। রাজা এবং তাঁর সভাসদ্‌গণ সবাই শিব ও মাধব দুইজনকেই সম্পূর্ণ নির্দোষ ব'লে সাব্যস্ত ক'রলেন। পুরোহিত শঙ্কর স্বামী নিজের মূর্খতার জন্য নিজেকে অভিশাপ দিতে দিতে ঘরে ফিরে গেলেন। শিব ও মাধব তাঁরই ধনে নিরাপদে রাজার হালে সেখানেই বাস করতে লাগল।

হংসাবলীর উপাখ্যান

কোশলের রাজা বিমলাকরের পুত্রের নাম কমলাকর। কমলাকরের যেমনি রূপ তেমনি গুণ। বিধাতা কার্তিক, মদন এবং কল্পতরু—এই তিন একসঙ্গে মিশিয়ে যেন তাঁকে গড়েছেন।

বন্দীরা রোজ এসে তাঁর নানা স্তুতিগান ক'রে যায়। একদিন এক বন্দী এসে তাঁর স্তুতি ক'রে বললে, বিকসিত পদ্মেভরা কমলাকর সরোবর পেলে হংসাবলীর যেমন শান্তি, প্রার্থীর মনোরথ-পূরণকারী অশেষ গুণাকর যুবরাজ কমলাকরকে পেলে রাজকন্যা হংসাবলীর তেমনি তৃপ্তি

বন্দীরা প্রতিদিন এসে যে সব স্তব ক'রে যায়—তার মানে বুঝতে কোনদিন কষ্ট হয় না যুবরাজের, কিন্তু আজ এ কি বলছে! এর অর্থ ত কিছু বুঝতে পারছেন না কমলাকর, এ যে অনেকটা হেঁয়ালির মতো। বিস্মিত যুবরাজ বন্দীকে বললেন, এ কি বলছ তুমি, এর মানে ত কিছু বুঝছি না, একটু খোলসা ক'রে বলো।

বন্দী মনোরথ সিদ্দি তখন সুযোগ পেয়ে বললে, প্রভু, যদি অভয় দেন ত বলতে পারি।

—হাঁ, নির্ভয়ে বলো তুমি, বড় কৌতূহল হচ্ছে আমার শুনতে।

বন্দী তখন হৃষ্টচিত্তে বলতে লাগল,—প্রভু, দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলাম আমি। বহু দেশ ঘুরে অবশেষে আমি রাজা মেঘমালীর রাজ্য উজ্জয়িনীতে গিয়ে হাজির হ'লাম, বাসা নিলাম ওখানকার সবচেয়ে নামকরা গাইয়ে কর্পূরকের বাড়িতে। কর্পূরক প্রতিদিনই রাজবাড়িতে গান শুনাতে, গান শেখাতে যান। একদিন তিনি রাজবাড়ি থেকে ফিরে এসে আমায় বললেন, কাল সকালে এখানকার রাজবাড়িতে নাচ হচ্ছে: রাজকন্যা হংসাবলী যে নতুন নাচ শিখেছেন, তাই দেখাবেন তাঁর বাপকে, যাবে দেখতে?

এমন সুযোগ কখনও ছাড়া যায়! ব'ললাম,—নিশ্চয়ই যাব।

পরদিন কর্পূরকের সঙ্গে আমি যখন রাজবাড়ির নাচঘরে গিয়ে হাজির হ'লাম, তখন দেখি বাদ্যের তালে তালে রাজকন্যা হংসাবলীর নৃত্য শুরু হয়ে গেছে। প্রভু, কি বলবো, এমন সুন্দরী মেয়ে আমি জন্মে দেখিনি, কেউ কল্পনাও বোধ হয় করতে পারে না, আর কি সে নাচ, দেখে মনে হচ্ছিল স্বর্গের প্রেম-লতিকা বুঝি বসন্ত বাতাসে সঞ্চালিত হচ্ছে! দেখে আর আমি চোখ ফেরাতে পারি নে, আর আমার কেবলি মনে হ'তে লাগল এ মেয়ের যোগ্য বর পৃথিবীতে শুধু একজন আছেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের রাজকুমার কমলাকর।

এই কথা মনে হ'তেই নাচের শেষে বাইরে এসে আমি রাজবাড়ির দরজার সামনে একটি ছবি এঁকে জোর গলায় বলতে লাগলাম, —আমার এই ছবির মতো ছবি যদি কেউ আঁকতে পারেন ত, এগিয়ে আসুন, আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আহ্বান করছি।

কেউ অবশ্য এগিয়ে এল না, কিন্তু রাজার কানে খবরটা গেলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর মেয়ের ঘরে আমায় ছবি আঁকতে বললেন। আমি রাজকন্যার ঘরের দেয়ালে আর দশটা ছবির সঙ্গে আপনার একটা প্রতিকৃতিও এঁকে ফেললাম। রাজকন্যা দেখি একদৃষ্টে ছবিটার দিকে চেয়ে রয়েছেন। ছবিটা কার—তার সুস্পষ্ট পরিচয় দিলে আমি মুশকিলে পড়তে পারি ভেবে এক কৌশল অবলম্বন করলাম: আমার এক বিশ্বস্ত বন্ধুকে পাগল সাজিয়ে রাজকন্যার ঘরের আশে-পাশে ছবির কাছে ঘুরাতে লাগলাম। মজা দেখবার জন্য রাজপুত্রেরা তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন নিজের নিজের মহলে,—রাজকন্যাও তাকে ডেকে নিলেন নিজের মহলে। সেখানে দেয়ালে আপনার ছবি দেখে তার দিকে চেয়ে আমার শেখানো মতো সে বলতে শুরু করলে,—আমার কি সৌভাগ্য, এখানে শঙ্খচক্রধারী শ্রীহরির মতো অনন্তগুণাকর যুবরাজ কমলাকরের মূর্তি দেখে আমার নয়ন সার্থক হ'ল, আমার কি আনন্দ, কি আনন্দ

পাগলের কথা শুনে রাজকন্যা আমার দিকে চেয়ে বললেন,—এ বলে কি, সত্যিই এ রকম কেউ আছেন না কি, তুমি কার ছবি এঁকেছ?

আমি বিনীতভাবে বললাম—আজ্ঞে, পাগল যা-বলছে তা' ঠিকই,—আমি কোশলের রাজকুমার কমলাকরের ছবিই এঁকেছি, ও বোধ হয় তাঁকে দেখে থাকবে, তাই ও কথা বলছে।

রাজকন্যা তখন আমার মুখের দিকে 'হাঁ' ক'রে চেয়ে রইলেন, আমি সুযোগ পেয়ে মুখেও আপনার রূপগুণের বর্ণনা করতে লাগলাম। চেয়ে দেখলাম আমার কথা শুনছেন তিনি আর ঘন ঘন ছবির দিকে চাইছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ-মুখের চেহারা একেবারে পালটে যাচ্ছে। আমার বুঝতে বাকী রইল না ছবি দেখে আর আমার কথা শুনে আপনার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মেছে।

হঠাৎ রাজা এসে গেলেন সেখানে। তিনি রাজকন্যার ঐ ভাব দেখে ব্যাপার বুঝে আমাকে এবং পাগলটাকে ঐখান থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

কিন্তু তাড়ালে হবে কি, রাজকন্যার মনে আমার দেওয়া ওষুধ তখন ধরে গেছে: আপনার রূপগুণ ধ্যানে তিনি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করলেন, শেষে নিজের মনকে নিয়ে একা থাকবার জন্য তিনি বাপের অনুমতি নিয়ে বিষ্ণুমন্দিরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। একদিন হঠাৎ আমি সেই মন্দিরে গেলে তিনি আমায় কিছু অলংকার আর একখানা সুন্দর কাপড় উপহার দিলেন। ঐগুলি নিয়ে বেরিয়ে আসতেই দেখি কাপড়ের আঁচলে কি যেন লেখা, পড়ে দেখি, আপনার উদ্দেশে এই শ্লোকটি লেখা:

প্রার্থীর মনোরথ পূরণকারী অশেষ গুণাকর যুবরাজ কমলাকরকে না পেলে রাজকন্যা হংসাবলীর মনে বিন্দুমাত্র শান্তি নেই।

প্রভু, এই দেখুন সেই বস্ত্র, আর এই রাজকন্যার লেখা সেই শ্লোক।

কমলাকর রাজকন্যার দেওয়া কাপড়ে রাজকন্যার লেখা শ্লোক দেখলেন, তার রূপগুণের কথা ত মনোরথসিদ্ধির মুখে আগেই শুনেছেন, সুতরাং রাজকন্যা হংসাবলী যেমন তাঁর চিন্তায় বিভোর তিনিও হংসাবলীর চিন্তায় তেমনি নিবিষ্ট হয়ে রইলেন।

কমলাকর যখন এই রকম হংসাবলীর চিন্তায় বিভোর তখন রাজা বিমলাকর তাঁকে ডেকে বললেন, বৎস, তুমি রাজার ছেলে, নিশ্চেষ্ট হয়ে দিন কাটানো তোমার উচিত নয়, তুমি দিগ্বিজয়ে বের হও, শত্রুদমন ক'রে নাম কেনো আমি মরবার আগে তোমার উন্নতি দেখে যেতে চাই, সুতরাং আর দেরি নয়, তুমি এবার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরিয়ে পড়। আমি চাই প্রথমেই তুমি অঙ্গরাজ্য জয় করো, কারণ অঙ্গরাজ আমার শত্রু।

বাপের এই কথা শুনে খুব খুশিই হ'লেন কমলাকর, কারণ দিগ্বিজয়ে বেরুলে হংসাবলী লাভের একটা উপায় হ'তে পারে।

অনেক সৈন্য-সামন্ত নিয়ে দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে প্রথমে তিনি অঙ্গরাজ্যই আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর অঙ্গরাজ পরাজিত এবং বন্দী হ'লেন কমলাকরের হাতে। বন্দী অঙ্গরাজকে বাপের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন অন্যান্য দেশ জয় করতে। এরপর অনেক রাজ্য জয় ক'রে বলশালী হয়ে তিনি উজ্জয়িনীতে এসে হাজির হ'লেন। সেখানে রাজধানীর অদূরে শিবির সন্নিবেশ ক'রে নিজের সম্যক পরিচয় দিয়ে হংসাবলীর পাণিপ্রার্থনা ক'রে রাজা মেঘমালীর কাছে এক দূত পাঠালেন। রাজা মেঘমালী দূতের মুখে সব খবর শুনে খুশি হয়ে নিজেই ছুটে এলেন কমলাকরের তাঁবুতে, এসে তাঁকে বললেন,—বাবা, দূতের মুখে যা খবর ব'লে পাঠিয়েছ, এ ত পরম আনন্দের কথা! হংসাবলীকে তোমার হাতে দেব ব'লেই ত আমি বসে আছি। সব কথা তোমায় খোলসা ক'রেই বলি, বাবা, শোন:

জগতের প্রত্যেক মা-বাপই নিজের মেয়েকে সুন্দরী দেখে, তা' নয়, মেয়ে আমার সত্যিই সুন্দরী, তা ছাড়া দেহমন তার সত্যিই বড় কোমল, সে আমার নয়নের মণি। কোথায় তার যোগ্য বর পাব, কিছুদিন ধরে এই নিয়ে আমি বড্ড ভাবছিলাম। ভাবনায় ভাবনায় বিষম জ্বর এসে গেল আমার। জ্বর উপশমের জন্য শ্রীহরির পূজা করতে শুরু করলাম আমি। একদিন তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখলাম, ঠাকুর আমায় বলছেন,—মেঘমালী, মেয়ের ভাবনায় তোমার জ্বর হয়েছে। তোমার মেয়ে নিত্য আমায় পূজা করে, এতে তার হাত অতি পবিত্র হয়েছে, তার করস্পর্শেই তোমার রোগমুক্তি হবে, শুধু তাই নয়, তোমার মেয়ে যে-কোন জ্বরাক্রান্ত রোগীকে স্পর্শ করলে সে রোগমুক্ত হবে; আর তার বিয়ের জন্যও তুমি ভেবো না, রাজকুমার কমলাকরই তার যোগ্য বর, তার সঙ্গেই ওর বিয়ে হবে। কিছুদিন অবশ্য ওদের একটু কষ্টে কাটবে, তারপরেই সব ঠিক হয়ে যাবে, ভেবো না তুমি। ভগবানের এই আদেশ শুনে আমার ঘুম ভেঙে গেল। এরপর হংসাবলার করস্পর্শেই আমার জ্বর সেরে গেল। আমি কেবল অপেক্ষা ক'রে আছি, কবে তুমি আসবে, কবে তোমার হাতে মেয়েকে সঁপে দেব।

মেঘমালীর কথা শুনে কমলাকরের আনন্দের সীমা রইল না। রাজা মেয়ের বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক ক'রে খুশি মনে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। হংসাবলীর বিয়ের কথা শুনে রাজবাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। হংসাবলীর মনে কিন্তু একটু উৎকণ্ঠা জাগল: চিত্রকর যে অপরূপ সুন্দর পুরুষের ছবি এঁকে গেছে ইনি সে-ই ত!

ভাবনায় পড়ে হংসাবলী তার সখী কনক-মঞ্জরীকে ডেকে বললে,—ভাই, তুমি একবার গিয়ে কৌশলে দেখে এসো না, কেমন এই রাজপুত্র! শিল্পী আমার ঘরের দেয়ালে যাঁর ছবি এঁকেছে ইনি সেই কি না!

কনক-মঞ্জরী রাজকন্যার কথায় তখনই রাজী হয়ে গেল। সে

তখন রুদ্রাক্ষমালা প্রভৃতিতে সজ্জিত হয়ে তাপসী মূর্তি ধারণ ক'রে কমলাকরের তাঁবুতে গিয়ে হাজির হ'লে কমলাকর তাকে যথাযোগ্য সমাদর দেখালেন। এদিকে কনক-মঞ্জরী কমলাকরকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল ঃ এমন রূপবান পুরুষ সে জন্মে দেখেনি, এর সঙ্গে কেবল প্রেমের দেবতা মদনেরই তুলনা হ'তে পারে। একে যদি পতিরূপে সে না পায় তাহ'লে তার জীবনধারণই বৃথা হয়ে যাবে।

কনক-মঞ্জরীর রাজপুত্রের প্রতি অনুরাগ এমনি প্রবল হওয়ায় সে এক কৌশল অবলম্বন করলে। সে একটি রত্ন কমলাকরের হাতে দিয়ে বললে,—রাজপুত্র, আমি তাপসী। এই মণিটি তোমায় দিচ্ছি, কারণ আমি দেখেছি এই মণি ধারণ করলে শত্রুর অস্ত্র বিফল হয়ে যায়। তুমি বীর, সুতরাং এ রত্ন ধারণের তুমিই উপযুক্ত পাত্র।

কমলাকর সসম্মানে রত্নটি গ্রহণ ক'রে কিছু দিতে গেলেন কনক-মঞ্জরীকে। কনক-মঞ্জরী বললে,—আমি তাপসী, আমার প্রতিগ্রহণ করতে নেই।

এরপর কনক-মঞ্জরী বাড়ি এসে বেশ পালটে মুখে রীতিমতো উদ্বেগের ভাব এনে হংসাবলীকে বললে,—ভাই, দেখে এলাম তোমার কমলাকরকে।

—কেমন দেখলে বলো, আমার তর সইছে না।

—সখি, সত্যিকথা গোপন ক'রে আর লাভ কি, খুলেই বলছি তোমায়। রাজকুমারের তাঁবুর সামনে গিয়ে আমি বললাম,—আমি ভূতের মন্ত্র জানি, ভূতছাড়াতে পারি আমি। শুনে প্রহরী মহা সমাদরে নিয়ে গেল আমায় রাজপুত্রের কাছে। গিয়ে দেখি চিররুগ্ণ রাজকুমার থরথর ক'রে কাঁপছেন, কয়েকজন লোক তাঁকে ধরে রেখেছেন, গলায় আর বাহুতে তাঁর অনেকগুলি মাদুলী বাঁধা। আমি দেখে বললাম,—কাল, এসে আমি ভূত ছাড়িয়ে যাব।

কনক-মঞ্জরীর কথা শুনে সরলমনা রাজকুমারী হংসাবলীর মনটা একেবারে দমে গেল। সে বললে,—ভাই, বিধাতা যাকে সুন্দর ক'রে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তার মাঝেও কলঙ্ক রয়ে গেছে, নইলে চাঁদে কলঙ্ক থাকবে কেন? আমি এঁর রূপগুণের কথা শুনে মনে মনে এঁকে স্বামিত্বে বরণ করেছি, অথচ তুমি যেমন বললে তাতে এমন কুৎসিত আর রুগ্‌ণ স্বামীকে নিয়ে কি সুখে জীবন কাটাব, এর চেয়ে আমার বনবাস কি, মরণই মঙ্গল।

কনক-মঞ্জরী একটু যেন কি ভাবার ভাণ ক'রে বললে,—ভাই, এক কাজ করলে কেমন হয়?

—কি?

তোমার বাবা যখন বিয়ে ঠিক করেছেন তখন ত বিয়ে হবেই। একটা কোন দাসীকে যদি তোমার পোশাক পরিয়ে হংসাবলী ক'রে সাজিয়ে দিই, তাহলে সম্প্রদানের হট্টগোলে কেউ আর বুঝতে পারবে না, সেই ফাঁকে তুমি আর আমি পালিয়ে যাব।

হংসাবলীর সরল মন, কোমল প্রাণ। বললে,—কিন্তু কারো অমতে এমন করা কি ঠিক হবে? কেউ যদি রাজী না হয়?

ধূর্তা কনক-মঞ্জরী বললে,—একদেশের রাণী হ'তে যাচ্ছে, রাণী হবে না কি গো,—আর কেউ রাজী না হয়, আমি ত আছি, বন্ধুর এটুকু উপকার করবো না, তুমি বলো কি গো!

সরলমতি হংসাবলী খুশি হয়ে আবেগে তার হাত ধরে বললে,—তোমার মতো বন্ধু আমার আর নেই।

কনক-মঞ্জরী বললে,—কিন্তু এর পর আমি তোমায় যেমন বলবো তেমন করতে হবে কিন্তু, নইলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।

হংসাবলী তাতে রাজী হয়ে গেলে কনক-মঞ্জরী তার এক বিশ্বস্তা সহচরী অশোককরীকে নিজের অভিসন্ধির কথা গোপনে জানিয়ে রাখল। কয়েকদিন পরেই বিবাহের দিন। রাজপুত্র কমলাকর অশ্ব-গজ-পদাতিক নিয়ে শোভাযাত্রা ক'রে এলেন, সকল লোকেই

বর ও বরযাত্রীদের আদর-অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত। সেই সুযোগে কনক-মঞ্জরী অন্যান্য দাসীদের সরিয়ে হংসাবলীকে এক গুপ্তগৃহে নিয়ে গিয়ে নিজে হংসাবলীর বেশে সেজে হংসাবলীকে অশোককরীর বেশে সাজাল। তারপর রাত্রি হ'লে তাকে বললে,—নগরের পশ্চিম দরজা দিয়ে বেরিয়ে ক্রোশখানেক গেলেই তুমি একটা শিমুলগাছ দেখতে পাবে, তাতে মস্ত বড় যে খোড়ল আছে, তাতে আত্ম-গোপন ক'রে থাকবে তুমি, এখানকার কাজ শেষ হ'লেই আমি তোমার সঙ্গে গিয়ে মিলিত হব, কোন চিন্তা নেই।

ধূর্তা কনক-মঞ্জরীর কথায় বিশ্বাস ক'রে রাজকন্যা হংসাবলী আশোককরীর বেশে সজ্জিতা হয়ে রাজপুরী থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এক ক্রোশ দূরে সেই শিমুল গাছের কাছে হাজির হ'ল, কিন্তু ঐ গাছের আঁধার খোড়লের মাঝে ঢুকতে তার সাহস হ'ল না, পাশেই একটা ঝাঁকড়া বটগাছ দেখে তাতে উঠে তার ঘন পাতার আচ্ছাদনের মাঝে লুকিয়ে সরল মনে সখী কনক-মঞ্জরীর আগমন প্রতীক্ষা করতে লাগল।

এদিকে বিয়ের লগ্ন এসে গেলে অবগুণ্ঠনবতী হংসাবলীর বেশধারিণী কনক-মঞ্জরীর সঙ্গেই কমলাকরের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পরই শুভক্ষণ থাকায় কমলাকর তার নব পরিণীতাকে নিয়ে নিজের সেনাবাসে চললেন। কনের সঙ্গে চলল কনক-মঞ্জরীর বেশধারিণী অশোককরী।

ক্রমে তাঁরা যখন সেই শিমুলগাছের কাছে এলেন তখন মিথ্যা হংসাবলী হাতীতে ব'সেই ভীষণ ভয়ের ভাব দেখিয়ে কমলাকরকে হঠাৎ জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল।

—কি, ব্যাপার কি ?

মিথ্যা হংসাবলী কাঁদতে কাঁদতেই বললে,—ভীষণ ভয় করছে আমার।

—কেন ?

গত রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি ঐ শিমুলগাছের ভেতর থেকে রাক্ষসীর মতো একটা স্ত্রীলোক বেরিয়ে আমায় খেতে আসছে, আমি দৌড়াচ্ছি, তখন এক ব্রাহ্মণ এসে আমায় রক্ষা করলেন আর বললেন,—বাছা, তুমি ঐ গাছটা পুড়িয়ে দিও, আর ওর মাঝ থেকে যদি কোন স্ত্রীলোক বের হয়, তাকেও ঐ সাথে পুড়িয়ে দিও, তা' হ'লেই তোমার মঙ্গল। ঐ গাছ দেখে সেই সব কথা আমার মনে হচ্ছে, তাই।

কমলাকর তখনই তাঁর অনুচরদের নারী সমেত সেই শিমুল গাছটিতে আগুন দিতে আদেশ দিলেন। শিমুলগাছ ভস্মীভূত হয়ে গেল। জাল হংসাবলী ভাবল হংসাবলী মরল, এবার সে নিষ্কণ্টক। কমলাকর জাল হংসাবলীকে নিয়েই তাঁর তাবুতে এবং পরদিনই নবপরিণীতাকে নিয়ে তিনি পিতৃরাজ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। ছেলে দিগ্বিজয় ক'রে, বিয়ে ক'রে ফিরে এসেছে দেখে তাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত ক'রে রাজা বিমলাকর বনে চলে গেলেন। কমলাকর নকল হংসাবলীকে ভার্যারূপে গ্রহণ ক'রে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। মনোরথসিদ্ধি আসল হংসাবলীকে চেনে, সুতরাং রাজা কমলাকরের কাছেই আমার মিথ্যাচরণ ধরা পড়ে যেতে পারে, এই ভেবে কনক-মঞ্জরী কৌশলে মনোরথসিদ্ধিকে দূরে সরিয়ে দিলে।

এদিকে আসল হংসাবলী বটগাছে থেকে যখন কনক-মঞ্জরীর সকল কথাই শুনলে এবং শিমুলগাছটি দগ্ধ হ'তে দেখলে তখন তার মনে নিদারুণ আঘাত লাগল; আমার প্রিয়সখী কনক-মঞ্জরী এমন বিশ্বাসঘাতক, এমন পাপিষ্ঠা, আমার স্বামীকে কেড়ে নেবার পরও আমাকে পুড়িয়ে না মারা পর্যন্ত তার শান্তি হ'ল না! আর বিনা দোষে শিমুলগাছটি আমার জন্যে দগ্ধ হ'ল। আমি এর ঋণ শোধ দেবার জন্যে অঙ্গারেই দেহ বিসর্জন দেব। এই কথা ভেবে রাজকন্যা গাছ থেকে নামল, কিন্তু পরক্ষণেই মনে

হ'ল : তাই বা করবো কেন, বেঁচে থাকলে এর প্রতিশোধও হয়তো একদিন নিতে পারবো। তাছাড়া, বাবা জ্বারাক্রান্ত হয়ে যখন শ্রীহরির আরাধনা করেছিলেন তখন শ্রীহরি তাঁকে স্বপ্নে বলেছিলেন আমার করস্পর্শে তাঁর জ্বরমুক্তি হবে, আর কমলাকরই আমার স্বামী হবেন, তবে কিছুকাল এ মিলনে বিঘ্ন হবে। সুতরাং কিছুকাল আমার অপেক্ষা করাই উচিত।

হংসাবলী কিছুকাল নির্জনে কাটাবার জন্যে এক নির্জন বনে প্রবেশ করলে। বনের কাঁটা আর কুশে তার পা ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যেতে লাগল। বেশ কিছুদূর যাবার পর এক জায়গায় দেখলে সুন্দর একটা সরোবর, আশে-পাশে তার নানারকমের অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে, দেখে হরিভক্ত হংসাবলীর মনে হ'ল, এইখানে থেকে এই ফুল দিয়ে আমি শ্রীহরির পূজা করি। তখন সে সেই সরোবরে স্নান ক'রে বনের সেই গাছগুলি থেকে পুষ্প চয়ন ক'রে ক'রে সে দেবতার পূজা করতে লাগল, আহার্য হ'ল তার বনের ফলমূল।

এদিকে কোশলপুরীতে রাজা কমলাকরের হ'ল ভীষণ জ্বর, মিথ্যা হংসাবলী ভীষণ ভাবনায় পড়ে গেল, একে ত অশোককরী কবে সকল কথা ফাঁস ক'রে দেয় সেই ভাবনা, তার উপর আবার এই দুশ্চিন্তা। রাজা বিমলাকর সকলের কাছেই প্রকাশ করেছেন কারো বিষম জ্বর হ'লে হংসাবলীর করস্পর্শে তা' নিরাময় হবে, এ ভগবান শ্রীহরির স্বপ্নাদেশ। এখন আমার করস্পর্শে যদি রাজার জ্বর না সারে তাহলেই ত আমি ধরা পড়ে যাব। তবে এক কাজ করা যাক : একবার এক যোগিনী দুষ্টজ্বর সারানোর এক অভিচার-বিধি শিখিয়েছিলেন আমায়, তাতে অভীষ্ট দেবতাকে তুষ্ট করবার জন্য চাই মানুষের খণ্ড খণ্ড দেহের অর্ঘ্য, এর জন্য অশোককরীকে দেবালয়ে নিয়ে কৌশলে হত্যা করবো আমি। এতে দুই কাজই হবে আমার, রাজার জ্বর সারবে আর অশোককরীর মুখ থেকে কথা ফাঁস হওয়ার আশংকাও থাকবে না।

নকল হংসাবলী মনে মনে এই সংকল্প ক'রে অশোককরীকে দেবপূজার সঙ্গিনী ক'রে পূজা উপচার আর খড়্গ নিয়ে গোপনে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে একলিঙ্গ শিবের মন্দিরে গিয়ে হাজির হ'ল। সেখানে প্রথমে ছাগবলি হ'ল, ছাগরক্তে শিবলিঙ্গকে স্নান করিয়ে ছাগের হৃৎপদ্ম তাতে অর্ঘ্য দিয়ে নাড়ী-ভুঁড়ি দিয়ে শিবের মাল্যদান ইত্যাদি ক'রে তার সামনের জায়গাটা রক্তচন্দনে লেপে গোরোচনা দিয়ে অষ্টদল এক পদ্ম রচনা করল, তার উপর পিটে দিয়ে তৈরি জ্বরের এক মূর্তি বসিয়ে তাতে বার তিনেক ভস্ম ছড়িয়ে দিল। তারপর বিড়বিড় ক'রে মন্ত্র পড়তে লাগল। এরপরই দরকার নররক্তে জ্বর-দেবতার স্নান, এবং দেহখণ্ড অঞ্জলি। কনক-মঞ্জরী তখন অশোককরীকে বললে, ভাই, তুমি একবার এখানে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করো, তাতে আমাদের কল্যাণ হবে।

অশোককরী সরল বিশ্বাসে যেই সেখানে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করেছে, কনক-মঞ্জরী অমনি তাকে খড়্গাঘাত করলে, কিন্তু ভাগ্যগুণে খড়্গটা গিয়ে লাগল একটা পাষাণে, অশোককরীর কাঁধের একটু জায়গা শুধু কেটে গেল। অশোককরী তখন কনক-মঞ্জরীর অভিসন্ধি বুঝতে পেরে একলাফে উঠে 'ঐ আমায় ধরল, কে আছ আমায় রক্ষা করো' ব'লে চিৎকার করতে করতে ছুটে পালাতে লাগল। কনক-মঞ্জরী তখন খড়্গ হাতে তার পিছু পিছু ধাওয়া করলে। এদিকে নগররক্ষীরা অশোককরীর চিৎকার শুনে তখন ছুটে এসে দেখে একটি স্ত্রীলোক খড়্গ হাতে তার পিছু ধাওয়া করছে। নগর-রক্ষীরা খড়্গাধারিণীকে রাক্ষসী মনে ক'রে অস্ত্রাঘাতে তাকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে দিলে। এরপর অশোককরী যখন সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে তখন দু'জনকেই তারা রাজবাড়িতে নিয়ে এল।

রাজা কমলাকর রক্ষীদের মুখে ব্যাপার শুনে তাঁর দুষ্টা ভার্যা এবং অশোককরী—দুইজনকেই তাঁর কাছে আনতে হুকুম দিলেন। কনক-মঞ্জরী রক্ষীদের প্রহারে এমন আহত হয়েছিল যে, রাজার

সামনে আনবার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেল। মারা গেল না বেঁচে গেল। রাজা তখন অশোককরীকে নির্ভয়ে সকল কথা জানাতে বলায় সে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত সব কিছু খুলে বললে।

শুনে রাজা কমলাকর একেবারে মুষড়ে পড়লেন—এ কি করেছেন তিনি: মিথ্যা হংসাবলীর ছলনায় সত্যিকার হংসাবলীকে নিজে হুকুম দিয়ে দাহ করেছেন! হংসাবলীর করস্পর্শে তাঁর জ্বরমুক্তি হবে এ শ্রীহরির প্রত্যাদেশ, রাজা মেঘমালী তাঁকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাই বা তিনি ভুললেন কি ক'রে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ায় মনে একটু আশার আলো দেখতে পেলেন তিনি: রাজা মেঘমালীর মুখেই শুনেছেন তিনি শ্রীহরির স্বপ্নাদেশ হংসাবলীর তাঁরই সঙ্গে বিয়ে হবে, তবে কিছুদিন কিছু কষ্টে কাটাবার পর। শ্রীহরির শ্রীমুখের বাণী ত মিথ্যা হ'তে পারে না, তাহলে হংসাবলী ত মরতে পারে না। নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে, কিন্তু কোথায়? কোথায় গেলে পাবেন তিনি তাকে। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল স্তুতিপাঠক মনোরথ-সিদ্ধির কথা। কোথায় গেল সে, সে হয়তো হংসাবলীর সকল খবর জানে।

খুঁজে পেতে পাওয়া গেল মনোরথসিদ্ধিকে। কমলাকর তাকে বললেন, এতদিন কোথায় ছিলে তুমি, হংসাবলীর খবর কিছু রাখো? উত্তরে মনোরথসিদ্ধি বললে, মহারাজ, প্রথম প্রশ্নের উত্তর অশোককরীর কাছে পাবেন, আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর শ্রীহরির আদেশে হংসাবলীকে আপনার সহধর্মিণী হ'তেই হবে, সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি বেঁচে আছেন, আপনি চিন্তিত হবেন না! আমি তারই খোঁজে বেরুচ্ছি।

রাজা বললেন, তুমি যদি যাও, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাব, তার খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত মন আমার কিছুতেই স্থির হচ্ছে না।

এই ব'লে রাজা কমলাকর তার পরদিনই প্রজ্ঞাঢ্য নামে এক মন্ত্রীর হাতে রাজ্যশাসনের ভার দিয়ে মনোরথসিদ্ধির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লেন হংসাবলীর খোঁজে। আশে-পাশের নানাদেশের আশ্রম আর বন-উপবনে খোঁজ করতে করতে অবশেষে তাঁরা যে বনে হংসাবলী তপস্যা করছে সেই বনে এসে হাজির হ'লেন। সেখানে এসে দেখেন লালফুলে ভরা এক অশোকতরুর নিচে ব'সে এক তরুণী তপস্যা করছে, তপস্যার কৃচ্ছ্রতায় চাঁদের অন্তিম কলার মতো পাণ্ডুর আর শীর্ণ তার রূপ। যার চোখ আছে সে সে-রূপ দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। রাজা তার দিকে মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন,—বলো ত কে এ তরুণী তপস্বিনী ধ্যানস্থা হয়ে বসে আছেন? এমন রূপ ত কই মানুষের হয় না, ইনি কি কোন দেবতা?

মনোরথসিদ্ধি বেশ কিছুক্ষণ তপস্বিনীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত উল্লসিত হয়ে ব'লে উঠল,—মহারাজ, শ্রীহরি কৃপা করেছেন, ইনিই আপনার হংসাবলী।

এদের কথাবার্তায় হংসাবলীর ধ্যান ভেঙে গেল, চোখ মেলেই সে দেখলে, সামনে তার সেই পরিচিত মনোরথসিদ্ধি, আর—আর তার সঙ্গে ইনি কে, কই এমন রূপ ত কোন মানুষের হয় না, তবে ইনিই কি সেই আমার শ্রীহরিদত্ত স্বামী কমলাকর? তখনই মনে হ'ল কি নয়, ইনিই তিনি। মনে হ'তেই আনন্দে, উল্লাসে শ্রীহরি, পিতা এবং স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে করতে সে মূর্ছিতা হয়ে পড়ল: কমলাকরও তার অবস্থা দেখে কাতর হয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন।

মনোরথসিদ্ধি অনেক যত্নে শুশ্রূষা ক'রে ওদের দু'জনকেই সুস্থ ক'রে তুলবার পর ওদের দু'জনারই মনে হ'তে লাগল ওরা যেন বিষসমুদ্র থেকে উঠলেন। দু'জনই তখন পরস্পরকে নিজের নিজের সকল কথা খুলে বললেন।

এরপর কমলাকর হংসাবলী আর মনোরথসিদ্ধিকে নিয়ে নিজের রাজধানীতে এসেই সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রাজা মেঘমালীর কাছে দূত পাঠালেন। দূত মুখে খবর পেয়েই মেঘমালী কোশলরাজ্যে কমলাকরের বাড়িতে এসে হাজির হ'লেন। তারপর শুভদিন শুভক্ষণ দেখে কমলাকরের সঙ্গে হংসাবলীর বিয়ে হয়ে গেল। কমলাকর সরোবর পেলে হংসাবলীর যেমন শান্তি, অশেষ গুণাকর রাজা কমলাকরকে পেয়ে হংসাবলীর তেমনি তৃপ্তি হ'ল।

তুলিকের গল্প

একটি লোক অনেক তুলো মাথায় নিয়ে বাজারে বিক্রী করতে গিয়েছিল, কিন্তু তার কিছুই বিক্রী হ'ল না সবাই বলে তুলো খারাপ। লোকটা বাজার থেকে আসতে দেখে এক স্বর্ণকার আগুন জ্বেলে সোনা পোড়াচ্ছে। তা দেখে সে স্বর্ণকারকে জিজ্ঞাসা করলে, আগুন জ্বেলে তুমি কি করছ ?

—সোনা শোধন করছি।

—সে কি ?

—খারাপ সোনা পুড়িয়ে ভাল করছি।

তুলোওয়ালা ভাবলে, তাহলে আমিও ত এমনি ক'রে আমার তুলো ভাল করতে পারবো। এই ভেবে সে অনেক খড়-কুটো জ্বেলে বড় রকমের আগুন ক'রে তার মাঝে সবটা তুলো দিয়ে দিল। দেখতে না দেখতে সব তুলো ভস্ম হয়ে গেল। তুলোওয়ালা 'হাঁ' ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মূর্খ চাকরের গল্প

এক ভদ্রলোকের এক মূর্খ চাকর ছিল, তাকে তেলী-বাড়ি তেল আনতে পাঠিয়েছিলেন তিনি। চাকরটি তেল আনবার সময় তার ভাঁড় ছাপিয়ে তেল পড়তে দেখে এক ভদ্রলোক তাকে সাবধান

ক'রে দিয়ে বললেন, ওহে, ভাঁড়টা একটু সাবধান ক'রে নাও, ভাঁড়ের নীচে দিয়ে তেল পড়ছে। ভদ্রলোকের কথা শুনে চাকরটা ভাঁড়টা অমনি উল্টো ক'রে দেখতে গেল--কোথা দিয়ে তেল পড়ে।

ব্যাস্, তেল একেবারে সাবাড় !

লবণাশীর গল্প

অজ্ঞ পাড়াগাঁয়ের একটি লোক কোনদিন লবণের স্বাদ গ্রহণ করেনি। একবার সে শহরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে লবণ দিয়ে রাঁধা তরকারী খেয়ে খুশি হয়ে যখন সে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে, তখন সে জানতে পারলে ব্যঞ্জনে লবণ দেওয়া হয়েছে ব'লে এমন স্বাদ। তখন লোকটার মনে হ'ল একটু লবণ দিলে যখন ব্যঞ্জন এমন স্বাদু হয়, তখন লবণ নিশ্চয়ই অতি মধুর সুখাদ্য। সে তখন গোপনে রান্নাঘর থেকে এক মুঠো লবণ তাড়াতাড়ি নিজের মুখের মাঝে ছুঁড়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ দিয়ে বেরুল, ওরে বাবা, একি, থুঃ থুঃ থুঃ—

মূর্খ গোদোহকের গল্প

কোন একটা পাড়াগাঁয়ে একটি লোকের একটি গোরু ছিল, সে রোজ পাঁচ সের ক'রে দুধ দিত। সেই দুধ বিক্রী ক'রে সে সংসার চালাত। বাড়ির কাছেই মাসখানেক পরে মহোৎসব। লোকটি ভাবলে গোরুটিকে যদি এমনি ক'রে রোজ দোহন না ক'রে একমাস পরে দোহন করি তা হ'লে একসঙ্গে অনেক দুধ পাব আমি, অনেক টাকা হবে আমার। এই ভেবে সে গরু দোহন বন্ধ ক'রে দিলে, তারপর একমাস পরে মস্ত এক গামলা নিয়ে যখন গোরু দুইতে গেল তখন এক ফোঁটাও দুধ বেরুল না গরুর বাঁট থেকে। মূর্খ গয়লা তখন অবাক হয়ে ব'লে উঠল, আরে এত দুধ গেল কোথায় ? সবাই তার কাণ্ড দেখে হাসতে লাগল।

টেকোর গল্প

এক টেকো ছিল, তার প্রচুর টাকা, কিন্তু মনে বড় দুঃখ: মাথায় একগাছা চুল নেই, এ মাথা নিয়ে পথে বেরুব আমি কি ক'রে, যে দেখবে সেই মনে মনে হাসবে। এই ভেবে সে যার সঙ্গেই দেখা হ'ত তাকে জিজ্ঞাসা করত, তোমরা কেউ এমন বৈদ্যের খবর জানো যে, আমার এ টাক ভাল ক'রে দিতে পারে? এক ধূর্ত সেই কথা শুনে বললে, হাঁ, আমার জানা এক ভাল বৈদ্য আছে, এই ব'লে সে এক পাগড়ী মাথায় লোককে এনে হাজির করলো। সে অনেক টাকা নিতে লাগল টেকোর কাছ থেকে। সঙ্গী ধূর্তকে তার ভাগ দিতে লাগল, কিন্তু বৈদ্যের ওষুধে টেকোর টাক আর সারে না।

একদিন পাগড়ী মাথায় বৈদ্য এলে টেকো তাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমার টাক সারে না কেন, কি ওষুধ দিচ্ছ তুমি?

বলতেই বৈদ্য তার পাগড়ী খুলে দেখাল তারও মাথায় বিরাট এক টাক।

টেকো তবুও বলে, এবার ভাল ওষুধ দাও, মোক্ষম ওষুধ।

বৈদ্য তখন বলে উঠল, মশায়, জীবনে আমি অনেক মূর্খ দেখেছি, কিন্তু আপনার মতো গণ্ডমূর্খ একটিও আমার চোখে পড়ে নি। দেখলেন আমারও মাথায় মস্ত এক টাক, টাক যদি ভাল করা যেত, তাহলে নিজের টাক সারাতাম না আমি?

উচ্চাভিলাষিণী চণ্ডালকন্যার গল্প

কোন দেশে এক পরম রূপবতী চণ্ডালকন্যা ছিল। রাজা সবার বড় মনে ক'রে তাঁর কাছ থেকে একটি পুত্রলাভের সাধ জাগল তার মনে। রাজা একদিন নগর ভ্রমণের জন্য বাইরে বেরিয়েছেন দেখে স্বামিবুদ্ধিতে সে তার পিছু যেতে লাগল। সেই

সময় পথে এক মুনি এসে হাজির হওয়ায় রাজা তাঁকে যেই প্রণাম করলেন অমনি তার মনে হ'ল রাজার চেয়ে মুনি বড়, সুতরাং পুত্র কামনায় সে মুনির পিছু নিল। মুনি কিছুদূর গিয়ে পথে এক শিবমন্দির দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে শিবকে প্রণাম ক'রে সেখান থেকে চলে গেলেন। চণ্ডালকন্যার মনে হ'ল তাহলে মুনি হ'তে এই শিবই বড়, সুতরাং শিবকেই স্বামিবুদ্ধি ক'রে সে সেখানেই রয়ে গেল। একটু পরে একটা কুকুর এসে শিবের মাথার উপর উঠে সেখানে ঠ্যাং রেখে নিজের জাতিসুলভ কার্য ক'রে চলে গেল। এ দেখে চণ্ডালকন্যা দেবতাকে ছেড়ে কুকুরকেই বড় মনে ক'রে স্বামিবুদ্ধিতে তাকেই অনুগমন করতে লাগল। কিছুক্ষণ চলার পরেই কুকুরটি চণ্ডালপল্লীতে এসে তার পরিচিত এক চণ্ডালযুবকের পায়ে পড়ে লেজ নাড়তে লাগল। এ দেখে চণ্ডালযুবককেই সর্বশ্রেষ্ঠ মনে ক'রে তাকেই পতিত্বে বরণ করল।

উচ্চাভিলাষী মূর্খেরা ঘুরে ফিরে শেষে নিজের জায়গায়ই ফিরে আসে।

মূর্খপুত্রের কাণ্ড

পুত্র মূর্খ। বাপ তাকে ডেকে বললেন, কা'ল ভোরেই তাকে অমুক গ্রামে একবার যেতে হবে।

পুত্র বললে, আচ্ছা।

ঘুম থেকে উঠে বাপ ছেলেকে আর খুঁজে পেলেন না বাড়িতে। সারাদিন কেটে গেলে সন্ধ্যাকালে বাপ পুত্রের দর্শন পেলেন বাড়িতে, অমনি ধমকে উঠলেন :

—সারাদিন কোথায় ছিলি তুই, হতভাগা ?

কেন, তুমি যে ভোরেই অমুক গ্রামে আমায় যেতে বলেছিলে, সেখানেই ত আমি গিয়েছিলাম।

—কি করতে হবে শুনে গেলি না ?

—শুনে যেতে বলো নি ত তুমি !

তৃষ্ণার্ত মূর্খ

সুদীর্ঘ বনপথ অতিক্রম ক'রে এসে বড় তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছে এক মূর্খ। বনের শেষেই একটি নদী, সেই নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়ে নদীর জলের দিকে চেয়ে 'হাঁ' ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন পথিক তাকে ঐ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি হাঁ ক'রে দেখছ কি ?

—ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে আমার।

—তা, ঐ ত নদী, খাও না জল !

—কিন্তু এত জল আমি খাব কি ক'রে ?

—হ্যাঁ, কম ক'রে খেলে রাজা তোমায় ফাঁসি দেবে—

এই ব'লে পথিক হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে গেল।

অদ্ভুত বাণিজ্য

বুদ্ধিমান হিসাবী বণিকেরা অতি অল্প মূলধন নিয়ে বহু অর্থ উপার্জন করতে পারেন এ কথা আপনারা সকলেই জানেন, কিন্তু শুনলে আশ্চর্য হবেন একেবারে বিনা বিত্তে বাণিজ্য ক'রে আমি বিপুল বিত্তের অধিকারী হয়েছি। কি ক'রে হয়েছি, সেই কথাই আজ আপনাদের বলবো। একেবারে গোড়া থেকে খোলসা ক'রেই বলি :

আমি বণিকের ছেলে। আমি যখন মায়ের পেটে তখন বাপ আমার মারা যান। পাপমতি জ্ঞাতিরা নানা কৌশলে আমার পৈতৃক ধন সমস্ত মায়ের কাছ থেকে অপহরণ করে। মা তখন আর বাড়িতে থাকতে না পেরে কুমারদত্ত নামে বাবার এক বন্ধুর

বাড়িতে এসে আশ্রয় নেন। সেখানেই আমি ভূমিষ্ঠ হই। মা কায়িক পরিশ্রম ক'রে আমাকে প্রতিপালন করতে থাকেন। ক্রমে আমি যখন বড় হ'তে লাগলাম তখন মা আমায় লেখাপড়া শেখাবার দরকার বোধ করলেন। একজন সহৃদয় শিক্ষককে অনুনয়-বিনয় করে খুশি করতে তিনি আমাকে কিছুটা বিদ্যাশিক্ষা দিলেন। সে আর কতটুকু, কোন রকমে লিখতে পড়তে পারা আর সামান্য গণিতে জ্ঞান।

ক্রমে আর একটু বড় হ'লে মা একদিন আমায় বললেন, বাবা, তুমি বণিকের ছেলে, বড় হয়েছ, এবার ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চেষ্টা করো।

আমি বললাম, ব্যবসা করবো মূলধন কোথায় পাব, মা?

মা বললেন, বিশাখিল নামে এক সহৃদয় ধনী বণিক আছেন এখানে, তিনি দরিদ্র বণিকদের বাণিজ্য করার জন্য মূলধন দিয়ে সাহায্য ক'রে থাকেন। তুমি তাঁর কাছে গেলেই কিছু মূলধন পাবে।

মায়ের কথায় আমি বিশাখিল বণিকের বাড়িতে গিয়ে হাজির হ'লাম। গিয়ে দেখি তিনি রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে আর একটি বণিকপুত্রকে ভৎর্সনা ক'রে বলছেন, তুমি অতি মূর্খ! বুদ্ধি থাকলে ঐ যে মরা ইঁদুরটা পড়ে রয়েছে ওটা পণ্য ক'রে লোকে বিপুল ধন উপার্জন করতে পারে, আর আমি তোমায় এত স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছি তুমি তা বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, সব শেষ ক'রে এসে আবার চাইছ!

বণিকের কথা শুনে আমি হঠাৎ ব'লে বসলাম, মশায়, আমি আপনার কাছ থেকে ঐ মরা ইঁদুরটাই মূলধন স্বরূপ নিচ্ছি। এই ব'লেই ঐ ইঁদুরটা নিয়ে আমি সেখান থেকে চলে এলাম। বিশাখিল আমার কাণ্ড দেখে হাসতে লাগলেন।

ঐ মরা ইঁদুরটি নিয়ে আর এক বণিকের বাড়ি এলে তিনি তাঁর বেড়ালের জন্য এক মুঠ ছোলা দিয়ে ঐ ইঁদুরটি আমার কাছ থেকে

কিনে নিলেন। আমি ঐ ছোলাগুলির ছাতু করে এক কলসী জল নিয়ে নগরের বাইরে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন কাঠুরে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে কাঠের বোঝা মাথায় ক'রে আমার কাছে এল। আমি তাদের ছোলার ছাতু আর জল খেতে দিলে তারা খুশি হয়ে প্রত্যেকে আমাকে দুইখানি করে কাঠ দিয়ে গেল। আমি সেই কাঠ নিয়ে গিয়ে দোকানে জ্বালানির জন্য বিক্রী ক'রে সেই দাম নিয়ে বেশি ক'রে ছোলা কিনে তা বাড়িতে নিয়ে চূর্ণ ক'রে পরের দিন আবার সেখানে গিয়ে বসলাম। সেদিন আরও অনেক কাঠুরে এলে আমি তাদের পরম সমাদরে ছোলার ছাতু এবং জল খেতে দিলে তারা আমায় অনেক কাঠ দিয়ে গেল। সেদিন সে কাঠ দোকানে বিক্রী ক'রে আগের চেয়ে অনেক বেশি অর্থ লাভ করলাম। এইরকম পরপর তিনদিন করবার পর আমার যে অর্থলাভ হ'ল তা দিয়ে আমি কাঠুরেদের সব কাঠ কিনে নিলাম। এই সময় পরপর কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ায় জ্বালানি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠল আমি তখন আমার সঞ্চিত কাঠ উচ্চমূল্যে বিক্রয় করলাম, এবং সেই অর্থ দিয়ে অমনি একটা দোকান করলাম। হিসাবমতো দোকান চালিয়ে এবং আরও নানারকম বাণিজ্যে অর্থ নিয়োগ ক'রে ক্রমে আমি বিপুল ধনের অধিকারী হ'লাম। এরপর যে বিশাখিল বণিকের কাজ থেকে আমি সেই মরা ইঁদুরটা নিয়েছিলাম, তাঁর ঋণ শোধ দেবার জন্যে একটা সোনার মূষিক তৈরি করিয়ে তাঁর ওখানে গেলাম। সুবর্ণ মূষিকটা তাঁর হাতে দিয়ে প্রণাম করলে তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি ?

আমি তখন আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা তাঁকে খুলে বললাম। তিনি তাতে খুশি হয়ে আমাকে তাঁর জামাই ক'রে নিলেন, এখন আমি বিপুলবিত্ত বিশাখিলের জামাতা এবং নিজেও বিপুল ধনের অধীশ্বর।

আমাদের প্রকাশিত ছোটদের গল্পের বইয়ের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অদ্ভুত যত গল্প	অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়-সম্পাদিত
অ্যাডভেঞ্চার অব লে ভেরী	বিশু মুখোপাধ্যায়
ওয়ার য়্যাণ্ড পীস	অশোক গুহ
আরো হাসির গল্প	স্বপনবুড়ো
গল্পে কাদম্বরী	কৃষ্ণধন দে
গল্পের রাজা ক্রীলভের গল্প	অনিলেন্দু চক্রবর্তী
গ্যালিভার্স ট্রাভেলস্	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়
ছোটদের আরব্য উপন্যাস	পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী
ছোটদের বেতাল পঞ্চবিংশতি	তারাপদ রাহা
দশকুমার চরিতের গল্প	কৃষ্ণধন দে
নানা দেশের রূপকথা	মনোরম গুহ-ঠাকুরতা
নীলসাগরের নীচে	চন্দ্রহাস
পিকউইক পেপারস্	অশোক গুহ
পুরানের সেরা গল্প	খগেন্দ্রনাথ মিত্র
বত্রিশ পুতুলের উপাখ্যান	কৃষ্ণধন দে
মহাভারতের গল্প	বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়
রবিনসন ক্রুশো	অশোক গুহ
রবিন হুড	দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়
শিবরাম The ভূপর্যটক	শিবরাম চক্রবর্তী